স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৬ ও জুন, ২০১৭

বাংলা (Bengali)

সহায়ক পাঠ্যক্রম (Subsidiary)

প্রথম পত্র (S-1) SBG-I : Bangla Sahityer Itihas O Bhasatattwa)

AMBITION

বিভাগ - ক

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ (অনধিক ৪০০শব্দে) **২০ x ২ =২০**

গ) প্রাচীন বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।

উত্তর ঃ- বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের স্থিতিকাল আনুমানিক ৯০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা ভাষার উৎসর্গী বা উদ্ভূত হল মাগধী বা প্রাচ্য াপভ্রাংশ অবহট্ ব ভাষা থাকে। প্রাচীন বাংলার খাঁটি নিদর্শন পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিস্কৃত ও প্রকাশিত হাজার হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগণ ও দোহা নামক বইটির প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' অংশ সংকলিত চর্যাগীতি গুলোর মদ্যে এরপর আমরা প্রাচীন বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো একে একে আলোচনা করবো।

ধ্বনির ক্ষেত্রে – ১। প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পূর্বস্তরের যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক। ব্যঞ্জনে পরিণত এবং সেই সাথে পূর্ববর্তী হ্রব স্বরের দীর্ঘীকরণ।

সংস্কৃতে যা ছিল যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে তাই হলো যুগ্ম ব্যাঞ্জন। বাংলা ভাষার আদিস্তর চর্যাপদে তাই-ই হয়েছে একক ব্যঞ্জন আর ক্ষতিপূরণ বা পরিপূরক হিসাবে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরিট দীর্ঘস্বর হয়েছে। তাই কজ্জ > 'কজ' না হয়ে হয়েছে কাজ। যেমনি জন্ম > জন্ম > জাম।

অবশ্য এর অনেক ব্যতিক্রম আছে–

২। প্রাচীন বাংলা চর্যাপদে পদের উন্তঃস্থিত স্বরধ্বনী বর্তমান ছিল। যেমন- ভগতি >ভনই, পুস্তিকা > পেত্থিআ > পোথী, উল্বিত > উটঠিস।

৩। প্রাচীন বাংলা ভাষার পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি আছে কিন্তু দুটি মিলে মিশে একটি স্বরে পরিণত হয়নি। যেমন উদাস > উআস এখানে উ, আ দুটি স্বরধ্বনী সন্ধিবদ্ধ হয়নি, পৃথক পৃথক আছে।

৪। প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধনীর মাঝে শ্রুতিধ্বনি হিসাবে 'য়', 'ব' ধ্বনি এসে গেছে। যেমন - য় আগম = নিকটে > নিঅডি > নিয়ড়ি।

'ব' আগম = ত্রিভুবন > তিহুঅন > তিহুবন, কবড়ি, আবই

৫। প্রাচীন বাংলায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বননি সাধারণত হ-কারের পরিণত হয়েছে। যেমন– মহাসুখ > মহাসহ, কথন > কহন

৬। প্রাচীন বাংলা ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপের প্রচুর উদাহরণ আছে। যেমন সকল > সঅল, সরোবর > সরেঅর

৭। প্রাচীন বাংলায় নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি কখনো কখনো লোপ পেয়েছে এবং অবলুপ্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধনী অনুনাসিক হয়েছে। যেমন মধ্যেন > মাঝেঁ, শব্দেন > সাঁদে।

৮। প্রাচীন বাংলায় উচ্চারণে বা ব্যবহারে 'ণ' এবং 'ন' এর মধ্যে পার্থক্য ছিল না। তাই একই শব্দের বানানে কোথাও 'ণ'কোথাও 'ন' যেমন নারী-নদী।

৯। প্রাচীন বাংলা ভাষায় শ, ষ, স–এই তিনি শিস ধ্বনির উচ্চারণে বা ব্যবহারে পার্থক্য ছিল না। তাই একই শব্দের বানানে কোথাও 'শ' কোথাও 'স' আবার কোথাও কোথাও 'স' 'ষ' হয়েছে। যেমন শূন-সূন শবরী - সবরী, সহজে - ষহজে।

১০। প্রাচীন বাংলায় 'য' ধ্বনি উচ্চারণে বা ব্যবহারে 'জ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল। তা চর্যাপদে বানানে কোথাও 'য' নেই। যেমন জে জে আইলা।

১১। প্রাচীন বাংল;য় আদিন স্বরে শাসাঘাত পড়েছে। আর তারই ফলে শব্দের আদি স্বরটি অনেক সময় দীর্ঘস্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন– আলোতোম্বী, আকট (অকট)

ব্যাকারণগত রূপের ক্ষেত্রে -১। প্রাচীন বাংলা ভাষায় রূপতত্ত্বগত একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নামপদে বিভক্তির চিহ্ন 'র' বা 'এর' ব্যবহার। এই বৈশিষ্ট্যটি একমাত্র বাংলা ভাষাতেই মেলে।

যেমন - রুখের তেন্তলি, হরিনার খুর ন দীস অ।

২। প্রাচীন বাংলা বাষায় কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি হিয় – এখানকার বাংলার মতই যেমন বাদ বি অ এল।

Edition 2017

৩। প্রাচীন বাংলায় কর্মকারকে ও সম্প্রদানে 'রে' বিভক্তি বর্তমান এটিও শুধু বাংলাতেই পাওয়া যায়। যেমন– তোহারে অন্তরে করিনা করিনীর রিসঅ।
৪। প্রাচীন বাংলা করণকারকে 'তে' বিভক্তি বর্তমান। এটিও বাংলা ভাষায় একটি নিজস্ব লক্ষ্মণ। যেমন সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি অই।
৫। প্রাচীন বাংলায় অধিকরণ কারকে 'ত' বিভক্তির প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এটিও বাংলার নিজস্ব বিভক্তি। এছাড়া অধিকরণে 'ই', 'এ', হি, তেঁ প্রভৃতি বিভক্তি আছে।

যেমন সাঙ্কমত চড়িলে, টালত ঘর মোর। মাঙ্গত চড়হিলে হাঁড়িত ভাত নাহি, চঞ্চল চীত্র, হিআইন পইসই, জামেকাম। কামে জাম।

৬। প্রাচীন বাংলা চর্যাপদের ভাষায় সম্বন্ধে-'র' এর 'ক' বিভক্তি হয়েছে এটিও বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন মোহোর বিগোআ, রুখের তেন্তলি।
৭। প্রীন বাংলায় সমাপিকা ও অসমাপিকা এই দুই ক্রিয়াই ছিল সমাপিকা ক্রিয়ার অতীতকাল বোঝাতে ইল ও ভবিষ্যৎকালে বোঝাতে 'ইব' প্রত্যয় যুক্ত হত। যেমন ইল-দেখিল, আইল, গেলা, ভইলা, ইব, হোইব, হজাইবেঁ, করিব।
৮। প্রাচীন বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ারও প্রচুর উদাহরণ মিলে। ইলে বা আন্তে প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন ইলে–সাঙ্কমত চড়িলে রাতি ভইলে

অন্ত জাগন্তে সুখাড়ী।

এছাড়াও নানা অসমাপিকার উদাহরণ হল দি আঁ চঞ্চালী জিঢ় অরিঅ অপনে বহিঃ।

৯। প্রাচীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃততের বহুবচন পদগুলি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সংঅস্মিভিঃ > প্রা অমহাহি > অপ।

এই বহুবচন পদটি একবচন আমি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ভনই লুই অমহে জনে দিবা। তেমনি তুস্মভিঃ (যুস্মাভি) > তুমহাহি > যুমহহি > তুমহে।
১০। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার খুব উল্লেখযোগ্য। যেমন - গুনিয়া লেহুঁ, দুহিল দুধু।
১১। প্রাচীন বাংলা ভাষায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কম বা ভাববাচ্যের বহুল ব্যবহার আছে। যেমন রাতি পোহাইলী, বাট জাইউ।
১২। প্রাচীন বাংলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল শব্দদ্বিত্ব যেমন উঁচা াঁচা পার্বত, জে জে আইলা তে তে গেলা।
১৩। প্রাচীন বাংলা ভাষায় যেমন সংখ্যা বাকে বিশেষ ছিল, তেমনি বহুতত্ব বোধক বিশেষণও, যেমন সংখ্যাবাচক = পঞ্চবিডাল, তিশরণ নারী, বহুত্ববোধক = সকল সমাহিঃ।
১৪। প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে অনেকগুলি প্রবাদ প্রবচন ছিল। যেগিলিকে বাংলায় নিজস্ব ঐতিহ্য বলে বিবেচনা করা হয়। যেমন–
ক) আপনা মাঁসে হরিনা বৈরী
খ) হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী
গ) জোসে বুধী সোধ নিবুধা।

ঙ) বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- সঙ্গীত সুর মূর্চ্ছনায় মানুষের হৃদয়ে যেমন আনন্দের দোলা লাগে উপন্যাসও তেমনি সর সৃষ্টি করতে পারে। কাহিনী, আখ্যায়িকা, চরিত্রের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সৃষ্টি হলে আমরা সুরের পরিচয় পেয়ে থাকি। উপন্যাে সমাপ্তি নয়, বিস্তীর্ণ তাই মূল কথা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস পাঠ করার পর আমাদের মনে একটি বিশেষ সুর বাজতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের রাজপুত্রকে সহাত্যের দরবারে এনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

''বঙ্কিম আনলেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে
আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালকের শিয়রে।''

এর ফলে মানুষের হৃদয় বীনায় বেজে উঠল এক নতুন সুর। বাঙালীর জীবনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের মিলনভূমিতে স্থান করে মননশীল সাহিত্য, সাহিত্য কথা, দেশ ও দশের কথা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তিনি বাঙালীকে উনবিংশ শতাব্দির জীবনরস ও প্রানবাণিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর জীবনরস ইংরেজী রোমান্স শ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসিক এর আদর্শে এবং সামাজিক, পারিপার্শ্বিক কথা সাহিত্যের আর্শে যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছেন আজ সে সব গ্রনআতের দেশকাল বহুদূর সরে গেলেও তাঁর গ্রন্থের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। বাস্তবযা, প্রাকৃতিক, সৌন্দর্য মধ্যযুগ প্রীতি মনস্তত্ব ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি আমাদের ১৪ খানি উপন্যাস উপহার দিয়েছেন। তাঁর জীবিতকালের শেষ ২২ বছরের মধ্যে (১৮৬৫-১৮৮৭) দুর্গেশ নন্দিনী, (১৮৬৫ যদিও এর আগে ১৮৬৪ সালে ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসে ইংরাজীতে লেখা Rajmoahans wife) ২) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), ৩) মৃণালিনী (১৮৬৯), ৪) বিষবৃক্ষ (১৮৭৯), ৫) ইন্দিরা (১৮৭৩), ৬) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), ৭) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), ৮) রজনী (১৮৭৭),

AMBITION
Edition 2017

৯) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), ১০) রাজসিংহ (১৮৮২), ১১) আনন্দমঠ (১৮৮৪), ১২) দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪) ১৩) রাধারানী (১৮৮৬), ১৪) সীতারাম (১৮৮৭) গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মে নিযুক্ত থেকেও মাত্র ২২ বছরের মধ্যে যিনি যে এতগুলি বিচিত্র শ্রেণির উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন এতেই তাঁর প্রতিতিভার ব্যাপকতা বা বলিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়েছে। এবার আমরা সংক্ষেপে তাঁর উপন্যাসগুলির শ্রেণী ও গুণ গত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি.

ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস এপর্বের অন্তর্গত উপন্যাসগুলির হল দুর্গেশনন্দিনী, কপলাকুণ্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর ও সীতারাম এর মধ্যে বিশুদ্ধ ইতিহাস ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চরিত্র নিয়ে লেখা রাজসিংহই একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাই বলেছেন এবং সাহিত্য একটি বিচারের মাপকাঠি তেও তা নির্ধারিত হয়। উপন্যাস এবং ইতিহাসকে পরস্পর সাপেক্ষ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে, কিন্তু ইতিহাসের মানুষ এখানে চিরন্তর পৃথিবীর মানুষ হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ডগতির কথা বলেছেন। সমালোচকদের মতে রাজসিংহই বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ইতিহসের চেয়ে নিত্য সচল মানবজীবনের নানান ঘাত প্রতিগাততই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন।

দূর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দন্দ্রেখর ও সীতারামের পাটভুমিকাতেও ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্র আছে কিন্তু এখানে ইতিহাসর পটে অনৈতিকহাসিক মানূহের কথা বেশী প্রধান্য পেয়েছে। দুর্গেশনন্দিনীতে হেমচন্দ্র মৃণালিনী পশুপতি, মনোরমা চন্দ্রশেখর এ চন্দ্রশেখর প্রতাপ শৈবলিনী কাল্পনিক সেগুলি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। অথচ দূর্গেশনন্দিনীতে বাংলার পাঠানমুঘলের প্রতিদ্বন্দ্বীতা কপালকুণ্ডলায় মুঘল শাসনের জাহাঙ্গির সমসাময়িক ঘটনা ও সীতারাম এ মুঘল আমলের শেষাংশে পটভুমিকা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। যুগলাঙ্গুয়ীতে হিন্দু আমলের আবহাওয়া থাকলেও এখানে সন তারিখ যুক্ত কোন ইতিহাসের প্রভাব নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সাথে রোমান্স ও কল্পনার খাদ মিশিয়ে যে উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন সেগুলিকে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা না গেলেও শিল্প বস্তু হিসাবে তার দাম সব যুগেই স্বীকৃত হবে। দুর্গেশনন্দিনী বিমলার পরিণাম জগৎ সিংহ তিলোত্তমা আয়েসা কাহিনী ও চরিত্র সহজে ভুলে যায় না।

তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস হল আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী। ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দমঠ উপন্যাসটিকে দেশাত্মবোধের মহাকাব্য বলেছেন বন্দেমাতারাম সঙ্গীতটি এই উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মুঘলযুগের শেষ ও ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে এর কাহিনীর পট বিস্তৃতি। কিন্তু বাইরে মুসলাম বিরোধিতা থাকলেও আসলে ইংরেজ কুশাসনের বিরুদ্দেই এই উপন্যাস রচিত হয়েছিল সরকারি কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু কল্পকুশলী ও দূরদর্শিতার পাঠক মাত্রেই এই উপন্যাসে আসল তাৎপর্ত বুঝতে পারবেন। যদিও এ উপন্যাসের মধ্যে শিল্প কলাগত ত্রুটি রয়েছে এবং কাহিণিতেও সংযমের অভাব, সৃষ্ট চরিতত্র দিক থেকেও লক্ষ্যমাত্র শান্তি ও ভাষানন্দ ছাড়া অন্য কোম চরিত্র সুপরিস্ফুষ্ট চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র সুফল হতে পারেনুি। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গীতত্ত্ব ও হিন্দু নারীর যথাযথ স্থান সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিয়েছেন যা উপন্যাসের পক্ষে অনেকটাই অবান্ত। যাইহোক, শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র নীতি আদর্শ ধর্ম ও সদাচার সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান হিন্দুর দিক থেকে যা ভাবছিলেন তার কিছু গাড় প্রভাব এ যুগের উপন্যাসে পড়েছে।

সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস বাঙালির পারিবারিক সামাজিক সমস্যা সতুকল উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র, বর্তমানেও আধুনিক উপন্যাসদের গুরুস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাসে সমস্যা বর্জিত বাঙালি পরিবারের মসৃণ ঘরোয়া কাহিনী বিবৃত হয়েছে এতে কোন অদ্ভুত কাহিণি বিন্যাস নেই। চরিত্রের গূঢ় মনস্তত্বও উপস্থিত নেই। কিন্তু একটি প্রসন্ন সহজ সরল ও সরস আখ্যান সহজেই পাঠকের প্রীতি আকর্ষন করতে পারে। যেমন ইন্দিরা ও রাধারানী আকারে এক দুটি উপন্যাস অনেকটা বড় গল্পের মতোই একে ইংরাজীতে Noveletie অর্থাৎ ছোট মাপের নোভেল বলা হয়। নানা বিপত্তির মধ্যে ইন্দিরা-র সাথে স্বামীর মিলন প্রথমাখ্যানে এবং রাধারানী নামে একটি বালিকার বাল্য প্রেমের সফলতা দ্বিতিয়ত আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। চরিত্রদ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক লক্ষণ এতে না থাকলেও সুখ পাঠ্য বড় গল্প হিসাবে জনপ্রিয়তা রয়েছে।

এবার আমরা বঙ্কিমের এমন কয়েকটি উপন্যাসের কথা বলব যেখানে তাঁর প্রতিভার নতন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অবশ্য একথায় ঠিক এ উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে তিনি পাঠন সমাজের কাছে নিন্দা ও প্রশংসা ভাগী হয়েছিলেন। আমরা বলতে চাইছি, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের ইউল ও রজনীর কথা যেখানে নর-নারীর আদিম সম্পর্কের জটিলতাই উপন্যাসগুলির মূলকথা। চিত্তসংযম,ে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা থেকে স্ত্রী পুরুষের শোচনীয় পরিনাম বর্ণনার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়কার পারিবারিক জীবনের অপর ভিত্তি করে এই তিনখানি উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ আত্মসংযাম অসমর্থন হয়ে নিষিদ্ধ কাননার যে বীজ বপণ করেছিলেন তাই একদিন বিষবৃক্ষ হয়ে তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বুন্দকরে গ্রাস করেছিল।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে লেখক বলেছেন যে, এই বিষবৃক্ষ থেকে ঘরে ঘরে অমৃত ফল উঠুক, আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, চরিত্রশুদ্ধি ও উপন্যাসে মূললক্ষ্য। ঘটনার গতি ও চরিত্র বিকাশ ও তারদিকে অগ্রসর হয়েছে 'কৃষ্ণকান্তের ইউল' উপন্যাসেও আত্মসংযমের অনিচ্ছা স্ত্রী ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে মত্ত হওয়া ও তার শোচনীয় পরিণাম ব্যক্ত হয়েছে। রজনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ উপন্যাসিক লিটন রচিত The Last days of

AMBITION
Edition 2017

pompei উপন্যাসে অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার চরিত্রের আংশিক প্রবাব বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান্ধ রজনী চরিত্র অংকন করেছে। নানা জটিল ও রহস্যময় ঘটনার মধ্য দিয়ে নায়ক সচীশ ও অন্ধ রজনীর বিবাহ এবং এরপরে কোন মহা পুরুষের কৃপায় তার দৃষ্টিশক্তি লাভ, এই হল উপন্যাসে মূল আখ্যান।

সবশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্রের কথা মনে রেখেও একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যসিক। বিষয় বৈচিত্র্যে রচনা প্রকরণ, উপন্যাসিকের জীবনদর্শনে তিনি এখনও অতুলনীয় রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হয়েছেন আবার শরৎ চন্দ্র সেপথকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বিপরীত পতে যাত্রা করেছেন। কিন্তু একথা ঠিক তাঁকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের পর এক শতাব্দী পার হয়ে গেছে কথা সাহিত্যের অনেক বৈত্রি, কলাকৌশল রক্ষা করেছি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশাল হিমালয়ের মতো বাংলা উপন্যাসের শীর্য দেশে দাঁড়িয়ে াছেন তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

AMBITION

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ (অনধিক ৩০০ শব্দে) ঃ **১২ x ৩ =৩৬**

খ) কবি চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল ও কবিকৃতির পরিচয় দিন।

উত্তর ঃ- পূর্বযুগের আবিভূত কবিদের মধ্যে বিদ্যাপরি মতো চণ্ডীদাসও একজন সেরা ও চিহ্নিত বৈষ্ণব কবি ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস কয়জন, কোথায় কার জন্মভূমি এবং তার সকলে চৈতন্য পূর্ব না চৈতন্য পরবর্তি যুগের ইত্যাদি বিহয়ে প্রশ্নের মধ্যে (চণ্ডীদাস সমস্যা) প্রবেশ না করে চৈতন্যপূর্ব যুগের একজন সেরা কবিরূপের তার সম্পর্কেই আলোচনা করা শ্রেয়।

শ্রী চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন, তার কোন বিস্তারিত বিবরণ মেলে না। শোনা যায় বিরভূমের নান্নুর গ্রামে বা বাঁকুড়ার ছাতনায় চণ্ডীদাসের জন্মভুমি। দুই জায়গায় এই চণ্ডীদাসের ছবি আছে তবু পণ্ডিতেরা মনে করেন বীরভূমের নান্নুরেই গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন। কেননা কবির পদে নান্নুর এর নামই আছে। ছাতনার নাম নেই। চণ্ডীদাসের জীবনী যা তথ্যের চেয়ে কিংবদন্তীই বেশী। যার মধ্যে প্রধান হল কবি নাকি এক রজনকন্যাকে সাধন সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই কবি সম্পর্কে একথাই বলা চলে যে যে তিনি একজন বাঙালী কবি ছিলেন। কেননা উদানিং কবি জয়দেবের ওপর স্বৈকলবাসীদের দাবি কিছু উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

চণ্ডীদাসের কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আলোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। চণ্ডীদাস ছুলিেন একজন বড় কবি এবং সাধক কবিও। ঠিক পালাবদ্ধ রং কি জলের জন্য চণ্ডীদাসের পদ পারমপর্য রক্ষা করে। আলোচনা ও বিন্যাসের কিছু অসুবিধার কথা সুধিজন স্বীকার করেছেন। কেননা তার কোন পদ প্রথাগত ভাবে এবং সুস্পষ্টরূপে কোন বিশেষ রসপর্যায়ের অন্তর্গত নয়। চণ্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগের স্তরেই—

''রিরতী আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা''

আবার মধুর মিলন লগ্নে এই রাধারই কন্ঠে শোনা গেল

''দুখিনী দিন দুখেতে গেল।''

চণ্ডীদাসের কবি মনের গভীর যে অতলান্তভাবে অনুভূতি তার একটি উজ্জ্বল পঙ্গক্তির মাধ্যমে উদ্ধার করা যায়।

''বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।''

এই বাহির দ্বার থেকেই আমাদের ফিরে আসলে চলবে না। ভিতরের রস রহসেয্য খবর নিতে গেলে চণ্ডীদাসের রাধার অনুস্মরণ করতে হবে। আর তা পূর্বরাগ থেকেই প্রেম পুহপরে প্রথম বিকশিত রূপই পূর্বরাগ কৃষ্ণনাম শ্রবণে এই রাধার চিত্ত ব্যাকুলতা শুরু —

''সই দেবা শুনাইল অন্যনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।''

কৃষ্ণ নাম স্মরণ করতেই যখন শ্রীরাধার দেহমন, এমন অবস হয়ে যায়, তখন দেহমল বা শুধু পরশটুকুতেই কি যে ঘটবে তা তো বলা যায় না।

'পসরিতে করি মনে পসরা না যায় গো'

Edition 2017

এই পূর্বরাহের আগুন্তিক আবেশই আত্মহারা রাখা। পূর্বরাগের দশ দশার বিভিন্ন পর্যায়ের রাধা অতিদ্রুত পৌঁছে যায়। পরিস্থিতি প্রেমভাবে আনত রাধার মর্মবেদনার আনর্বচনীয়। আর প্রকাশ করলে কেই বা বিশ্বাস করবে। কেননা রাধার মতো কৃষ্ণানুরাগ আর তো কারুর নেই।

চণ্ডীদাস যে পূর্বরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিগুরু পরিচয় শুধু রাধার পূর্বরাগেই পাই না। কৃষ্ণের পূর্বরাগ মূলক কয়েকটি কবিতারও পাই। চিরন্তন নারীর অপরূপ রূপদর্শনে বিরায়ত মানবের অধিকার আজজাতির সাহিত্যের

স্বীকৃতে। প্রেমের কবি চণ্ডীদাস তা জানতেন তাই তার রাধা কৃষ্ণ কান্তা, আবার কৃষ্ণও রাধা কাণ্ড। রাধারার আন্দম দর্শন। এই কৃষ্ণ আত্মহৃতা হয়ে বলেন।

'স্থির বিজুরি বরুন গোর
দেখিনু ঘাটের কূলে।'

অথচ এই বাধাকে কাছে পাওয়ার আকুলতা কৃষ্ণের কম নয়। তাও কৃষ্ণের মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে এমন একটি পদতুলে রাধা ''চলে লীন শাড়ি লির্বাক নির্ভিক
পবান সহিত মোর''।

চণ্ডীদাস প্রেমের কবি প্রেমই চণ্ডীদাসের জীবনের সর্বস্ব। তার কাব্যে ও সাধনার প্রেমেই পরম পুরুকার্থ। তিনি জীবন ভুবন প্রমময় দেখেন। তাই নিজ জীবনের প্রেমকে বিশ্বজীবনের মানখানে এমনবাবে পরিব্যপ্ত করতে পেরেছেন। কবিরা বলেছেন, বিরহের পর মিলনই সুখ। আর চণ্ডীদাস বলেছেন মিলনের মধ্যে বিরহের ব্যাথার কথা। অর্থাৎ দুঃখের অবসানে সুখের আবির্ভাব নয়। বরং সুখের মধ্যেই দুঃখের বীজ নিহিত হয়। তাই মিলনের মধ্যে যে বিরহের ডাকে যে ব্যাকুলতা সেই প্রেম বৈচিত্র এবং মিলনের মধ্যে স্বাদ না মেলার আক্ষেপনুরাগ, এই পর্যায়ে চণ্ডীদাসের কি প্রতিভাব নেতৃত্বের শিক্ষাসাধন।

প্রেম বৈচিত্রের পরিকল্পনা চৈতন্য ভাবাদর্শ এবং উত্তরকালের সিদ্ধান্তের অনুকূল। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, চণ্ডীদাসের মানসেই এই প্রেমের স্বরূপ নিহিত ছিল। গভীর মিলনের মধ্যেও বিরহাকলুলতা। চণ্ডীদাসের অনেক অনুরাগের পদে দেখা যায়।

''দুহুঁ, কোরে দুইগ চোঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।''

নিখিলের অর্ন্তবেদনাই যেন নিত্যকালের রূপ পায় চণ্ডীদাসের প্রেম বৈচিত্রের পাদ আর আবেগনুরাগের পদে।

আক্ষেপানুরাগে রাধা কৃষ্ণের অনাদরে দিয়ে এবং বিরহতাকে কাটিয়ে।

যে রাগ প্রিয়কে নিত্য নবরূপে অনুভব করায় সেই তো হল অনুরাগ। এই ণঅুরাগের বলেই রাধা অক্ষেপ করেন। কৃষ্ণকে কাছে পেয়েও যেন তিনি পান নি। ক্ষণকালের আদর্শনেই তাঁর কাছে বিশ্ব সংসার শূন্য মনে হয়। রাধার তার মন প্রাণ ানুভূতি কৃষ্ণকে ঘিরে 'সদা সে কালিয়া কানি হয়ে অনুভব্য' এই কৃষ্ণের জন্যই রাধা

''ঘর কইনু বাহির বাহির কইনু ঘর
আপন কইনু পর্ব পরু কইনু আপন
বাতি প্রইন দিবস। দিবস কইনু রাতি।''

এই করেও সেই যেন প্রহস্যরে সন্ধান না পেয়ে রাধা বলেছে 'পারিনু বন্ধু তোমার পিরিতি।''

চণ্ডীদাস সব কবি প্রতিভার আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করলে তাঁর সময়ের আলোচনা খণ্ডিত থেকে যাবে। সেই বৈশিষ্টটি হল আত্মনিবেদন পর্যায়ের পদে। তাঁর কৃতিত্ব।

পূর্বরাহের রাধার সাথে এই আত্মনিবেদন পর্যায়ের রাধার সাদৃশ্য তুলনা করা যেতে পারে প্রেমের ফুলের একটি গাঁথা মালার দুই প্রান্ত সীমার সাথে যার গ্রন্থি মিলনে একটি পূর্ণায়ত মাল্যরচনা সম্ভব. পূর্বরাগ থেকেই তো রাধা শ্রীকৃষ্ণের নাম জপের মধ্যে দিয়েই একরকম আত্মনিবেদিত কৃষ্ণ সম্পর্কে যে গভীর প্রেমানুভব ও গভীর বেদনা পূর্ব পূর্ব পর্যায়ে। পদগুলিতে রাধা পূর্ণাঙ্গ ভাব। কোথাও কুন্ঠা ও বাধা পেয়েছিল। কিন্তু এই আত্মনিবেদনের পদে রাধা বিগত কুন্ঠা। ফলে কৃষ্নরে কাছে তাঁর আত্মনিবেদন শুধু যে অকুন্ঠ রয়েছে তাই নয়, হয়েছে অপরিবর্তিত চণ্ডীদাসের রাধা তাই বলতে পেরেছেন–্য

''বধু তুমি সে আার প্রাণ।
দেহ মন আজি তোমারে সোঁপেছি।
কুশশীল জাতিমন।''

রবীনন্রনাথ একজায়গায় লিখেছেন 'কঠোর রসসাধনা স্বরূপ প্রেম সাধনা করা চণ্ডীদাসের আছে–' সেই প্রেমরর পদাবলী রচনায় এই চণ্ডীদাস লোকান্তকার। দুঃখের বেদনায়, চোখের জলে গড়া তাঁর পদাবলীতে উচ্চারিত হয় স্বর্গের অমৃত ধারা।

কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি শ্রষ্ঠা হিসেবে যেমন উত্তরকালে পদ সাহিত্যের ভাষার তাঁর অনস্বিকার্য অবদান রেখেছেন, তেমনি চণ্ডীদাসও পদাবলীর ভাষারূপ বাংলা কাব্যভাষা রীতির এক অনন্য অলংকৃত ভঙ্গির শ্রষ্ঠা। উত্তরকালের জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাব-ভাষা এবং প্রকাশরীতিই অনুসারী একজন প্রধান কবি। তাই অনেকে জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভবিষ্যও বলে থাকেন।

চণ্ডীদাসের পদে ক্ষরাধার অন্তর ভাবের এবং সে সাথে বিতও রূপ প্রয়োগে কত সতেজ ও প্রণবান সুখের।

ক) ''কলঙ্কের ডালি মায়ার করিল আনল ভেজাই ঘরে'
খ) 'হাত বাড়াইল কাঁদে।'

AMBITION Edition 2017

গ) লাজ ধুইলে না খুঁজে।'

ঘ) জল বিন্দু মিল যেন জিয়োয়ে।'

আর সযত্নে প্রয়াস প্রযত্নহীন চণ্ডীদাসের ভাষা বাঙালীর প্রণারে বাষার চণ্ডীদাস বাঙালীর প্রাণলোকের কবির বৈষ্ণব কবিকূলের তিনি এক সমুচ্চ গৌরবজ্জ্বোল স্থায়ি আসনের অধিকারী।

ঙ) আধুনিক বাংলা ভাষার উপভাষা কয়টি এবং কী কী ? এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর ঃ- একই ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অঞ্চলভেদে দৈনন্দিন ধারাবাহিক কাজে ও কথাবার্তায় ধ্বনিগত, রূপগত এবং বিশিষ্ট বাগ ধারাগত বৈশিষ্ট্য নিযে যে ভাষা প্রচলিত থাকে। তাকে উপভাষা বলে। একই ভাষার অন্তর্গত এক একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষাগুলির বিশেষ রূপের সাথে আদর্শ ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনি রূপ ও বাগ্‌ধারার ব্যবহারে অনেক পার্থক্য থাকে।

সব ভাষা গোষ্ঠিরই উপভাষা থাকেনা। সাধারণত ক্ষুদ্র ভোগলিক সীমার মধ্যে নিতান্ত অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়ে কোন ভাষা সম্প্রদায় গড়ে উঠলে সেখানে কোনো উপভাষা পরিনিম্ন সময় কারণ, ছোট্ট পরিসরে সকলের সাথে সকলের ঘনিষ্ঠ আদান প্রদান বিনিময়ের পরিপূর্ন সুযিগ থাকায় ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারন দোষ কিংবা ভুল প্রয়োজগজনীত বিভেদ গবে ওঠবার কোন অবকাশই থাকে না। এই ভাবেই বাংলা ভাষা গোষ্ঠি পাঁচটি প্রধান ওপভাষিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গেছে - রাঢ় অঞ্চলে রাঢ়ী উপভাষা, বরেন্দুমি অঞ্চলে বরেন্দ্রী উপভাষা, বঙ্গাল ভুমিতে বঙ্গালী, ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে ঝাড়খণ্ডী এবং কামরূপে কামরূপী উপভাষার সৃষ্টি হযেছে।

ভোগলিক, রাষ্ট্রিক সামাজিক ইত্যাদি কারণে যেমন একাধিক উপভাষার উদ্ভব হতে পারে, তেমনি কোনো একটি উপভাষা শক্তিশালী হয়ে অন্য উপভাষাগুলোকে নিজের আয়ত্ত করে কিংবা লুপ্ত করে এককভাবে পূর্ণ ভাষারূপে উদ্ভুত হতেও পারে।

উপভাষাগুলোর ভোগলিক এলাকাগুলি হল-

উপভাষা	ভৌগলিক অবস্থান
রাঢ়ী	মধ্য পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম রাঢ়ী - বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া, পূর্ব রাঢ়ী, কলকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, গুহলী, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ।
বাঙ্গালী	পূর্বঙ্গ ও দক্ষিন-পূর্ব (ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালি চট্টগ্রাম)।
ঝাড়খণ্ডী	দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত বঙ্গ ও বিহারের কিছু (মানভুম, সিংভূম, ধলভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ - পশ্চিম মেদিনীপুর।
কামরূপী বা রাজবংশী	উত্তর পূর্ববঙ্গ (জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, ক্ষহট্ট, ত্রিপুরা।

এই সমস্ত উপভাষাগুলির মধ্যে রাঢ়ী ও উপভাষা প্রধান উপভাষা হিসেবে পরিগণিত। ঝাড়খন্ডী বস্তুত। রাঢ়ী উপভাষারই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ। উভয় উপভাষার সাদৃশ্য বর্তমান, এক সময় বরেন্দ্রী উপভাষার সাথে রাঢ়ী উপভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। পরে প্রবাবে বরেন্দ্রী উপভাষা বিশিহটতা লাভ করে। কারমরূপ উপভাষা বঙ্গালী ও বরেন্দ্রীর মাঝামাঝি, তবে বরেন্দ্রীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

রাঢ়ী উপভাষা-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় উপভাষাকে প্রধান রূপে গ্রহণ করে শিষ্ট কথ্যভাষারীতি গড়ে উঠলেও তা যে অন্যান্য ছিল না, তা নয়, নানা কারণেই তা বিভিন্নকালে অপর উপভাষা সহায়তা গ্রহণ করেছে। অতীতকালের প্রথমপুরষের রাঢ়ী উপভাষার রূপ 'ইলুম, ালু ইলো-নু প্রভৃতি। কিন্তু বঙ্গালী ভাষার প্রবাবে পশ্চিম ভাষায় নতুন যুক্ত হলো 'ইলাম, ইলেম এবং বর্জিত হল 'ইলো-নু' প্রভৃতি। রাঢ়ী সমর্থক প্রক্রিয়া অতীতকালের প্রথম রূপ হলে বঙ্গালী প্রভাবে 'ইল' এই বিকল্প রূপও স্বকীয় নিয়েছে। সাধুভাষায় আসিল শব্দের রাঢ়তে এলো রূপটি প্রভাবজাত (আইল > এলো 'হওয়া সম্ভব')

সার্বভোম সাধুভাষার এবং বঙ্গালী বরেন্দ্রী ভাষার প্রভাবে ঘাঁটি রাঢ়ী ওপভাষিক লক্ষণ শিষ্ট ভাষা থেকে পরিমাপে বর্জিতও হয়েছে। উপভাষায় যে পরিমাণ অর্ধতৎসম ব্যক্ত হয়। তাদের অধিকাংশই প্রমিত ভাষায় প্রবেশাধিকার পায়নি যেমন আহিংকে (> আকাঙ্খা), অলবডেড (> অল্পবৃদ্ধ) ছেরেদা (>শ্রদ্ধা),

পাঁচটি উপভাষায় কীবাবে পরিবর্তিত হয়ে গেলে শ্রদ্ধেয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসরণে তারই নিদর্শন দেখাচ্ছি।

রাঢ়ী (কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কথা) 'একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটিটি বাপকে বললে- বাপ বিষযের মধ্যে যে ভাগ আমি পাবো। তাতে তাদের বাপ তাঁর বিষয আশয় তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

বঙ্গালী (ঢাকা -মানিকগঞ্জ অঞ্চলে কথ্য) 'য়্যাক জুনের দুইডা ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো–বাবা আমার বাগে যে বিত্তি ব্যাসাদ পরে তা, আমার দ্যাও। তাতে তিনি তাল বিষয়-সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান''।

AMBITION Edition 2017

এই উপভাষাই চট্টগ্রাম অঞ্চলে কথিত হলে নিম্নলিখিত পরিবর্তিত হয়ে যায়।

''এগ্‌গোয়া মা ইনষের দুয়া পোয়া আছিল। তার মৈদ্দে ছোড়ুয়া যে কইল্ বা-জি, অওনর সম্পত্তির মৈদ্দে যেই অংশ পাইয়ম্, হেইইন আঁরে দেওক। ত-অন, তারার বাপ তাপের মৈদ্দে নিজের সম্পত্তি ভাগ করি দিল্।''

বরেন্দ্র (মলদহে কথ্য) 'য়্যাক ঝোন্ মানুসের সুটো ব্যাটা আছে, তার ঘোর বিচে ছোটকা আপনার বাবাকে কহলে বাবা ধন যে হিস্যা হামি পামু, সে হামাক দে। তাৎ তাঁই তারঘোরকে মালয় সব ব্যাঁটা দিলে।''

কামরূপী (কোচবিহার) ''এক জমা মানসিক দুই কো বেটা আছিল। তার মদ্দে ছোট জন উপর বাপোক্ কইল, বা সম্পাদ হিস্যা মুই পাইম, তাক মোক্ দেন। তাতে তাঁর তার মাল দেখানো ব্যাটাক বাটিয়া চিরিয়া দিল।''

ঝাড়খণ্ডী (মানভুমে কথিত) ''এক লোকের দুটা বেটা ছিল, তাদের মাঝে ছুটু বেটা তার বাপকে বল্লেক, বাপ হে আমাদের দৌলতের যা হিস্বা আমি পাব, তা আমাকে দাও। এতে তার বাপ আপন দৌল্য বাখরা করে তার হিস্বা তাকে দিলেক।'

ছ) নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র-র বৈশিষ্ট্য এবং সার্থকতা দেখান।

উত্তর ঃ- নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য প্রতিভা ঃ- দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-'৭৩.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন, 'শেক্সপিয়র তাঁহার পূর্বতন নাট্যকার ক্রিষ্টোফার মারলোর বহু নাটক হইতে ভাবগ্রহণ করিয়া ও যেমন এলিজাবেথীয় সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, দীনবন্ধু মিত্রও তেমনি অগ্রবর্তী পথিকৃত। মধুসূদনের দ্বারা অশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াও মাইকেলী যুগের শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার রূপে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হইয়াছেন।

মধুসূদনের মতো উচ্চাঙ্গ কবিপ্রতিভা দীনবন্ধুর ছিল না বটে কিন্তু প্রকৃত নাট্যকার হতে গেলে যে গণচেতনা, আপামর জনসাধারণ সম্বন্ধে যে বাস্তব দৃষ্টি এবং বৃহত্তর মানব সমাজের সুখে ও দুঃখে সহানুভূতির প্রয়োজন দীনববন্ধু মিত্র তার অধিকারী হয়েই বাংলা নাটক রচনায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর এই ব্যাপক সহানুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সথে সাথে সৃজনী প্রতিভার যদি তুল্য রূপ মিশ্রণ ঘটত তবে বাংলা সাহিত্যে সর্বাঙ্গ সুন্দর নাট্য সৃষ্টি সম্ভব হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয়নি.

দীনবন্ধু নাটকে ও প্রহসনে তৎকালীন সমাজ অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রতিচ্ছবি বর্তমান। তিনি তাঁর প্রহসনের রঙ্গরসকে বস্তব জীবনের কঠোর পরিবেশের নামিয়ে এনে প্রথম শ্রেণির নাট্যপ্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিতমালায়' দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর যে তালিকা দিয়েছেন তার মধ্য থেকে কবিতাগ্রন্থগুলি বাদ দিলে দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনের কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নরূপ –

১। নীল দর্পণ (১৮৬০)–নাটক্য
২। নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) নাটক
৩। বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৩৫) প্রহসন
৪। সধবার একাদশী (১৮৬৬) প্রহসন
৫। লীলাবতী (১৮৬৭) নাটক
৬। জামাই বারিক (১৮৭২) প্রহসন
৭। কমলে কামিনী (১৮৭৩) নাটক।

বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধুর প্রথম আবির্ভবা হয় 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে। ডাক বিভগের সরকারী কর্মচারী ছিলেন বলে প্রকাশকালে নীলদর্পণে লেখকের নাম ছিল 'কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণিতং' নামে শ্রী রামচন্দ্র ভৌমিকের বাংলা যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

বাংলা নাটকের ধারায় 'নীলদর্পণ' নাটকটি একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। নীল দর্পণের বিষয়বস্তু মূলতঃ সমকালে প্রচলিত নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন। যদিও বিষয়বস্তু দিক থেকে বিচার করলে নাটকটিকে প্রতিবাদের বা বিপ্লবের নাটক বলা যাবে না। তবু নীল সাহেবদের অত্যাচারের স্বরূপ ও অসহায় চাষিদের দুর্গতির চিত্র মেলোড্রোমাটিক ভঙ্গিতে প্রকাশ করায় এবং ন্যাশানাল থিয়েটারের দল থেকে মঞ্চস্থ করায় জনগণের মনে নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

নাট্যশিল্পের দিক থেকে 'নীলদর্পণ'-এ কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে। কাহিনী গঠনে এবং পরিণতি রূপায়নে কিছু দুর্বলতা দেখা যায়। নাটকের বড় ত্রুটি ভদ্র চরিত্রগুলির সংলাপ সৃষ্টিতে। হয়ত দীনবন্ধু সংলাপ সৃষ্টি। সংস্কৃত নাটকের প্রকারনিক পদ্ধতির দ্বারা ভ্রান্তভাবে চা;তি হয়ে ভদ্র চরিত্রে এমনই আড়ত্ব সাধু সমাজবহল দীর্ঘসংলাপ রচনা করেছেন যা ক্লান্তিকর এবং অ-নাটকীয়। নীলদর্পণের দ্বিতীয় ত্রুটি হল নাটকের পরিণতিতে অধিক সংখ্যক মৃত্যুর ব্যবহার। একটি সম্ভাবনাপূর্ণ মোলাড্রামায় পরিণত করেছেন। অবশ্য পক্ষান্তরে সাধারণ চাষীদের চরিত্র ও সংলাপ সৃষ্টিতে যে এ্যাকশন মুখর পরিবেশ নির্মিত হয়েছে., তোরাপের মতন চরিত্র সৃষ্টিতে যে দক্ষতা পরিস্ফুট হয়েছে কিংবা অত্যাচারী রোগ সাহেবের যে জীবন্ত চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে এগুলির দ্বারা 'নীলদর্পণ' নাটক বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলে চিহ্নিত হবে।

'নবীন তপস্বিনী' ও 'কমলেকামিনী' মূলতঃ দীনবন্ধু রোমান্টিক নাটক। আখ্যান নির্বাচনে নাট্যকারের সুকৌশলী বুদ্ধির পরিচয় থাকলেও নায়ক নায়িকার রোমান্টিক প্রেম প্রসঙ্গে বর্ণনায় যথেষ্ট দুর্বল নাটকীয়তা স্পষ্ট

AMBITION
Edition 2017

হয়েছে বরং পার্শ্বচরিত্র গুলি পরিহাস ও অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে দর্শকের অধিকতর প্রীতিভাজন হয়েছে। 'নবীন তপস্বিনী'-র জলধর চরিত্র সেক্সপিয়ারের 'Merry wives of wirdsos'-এর স্মরণ করিয়ে দিলেও তাকে নিছক অনুসরণ বলে মনে হয় না। দীনবন্ধু রোমান্টিক আখ্যান ও ঘটনা সংস্তান বর্ণণায় কোনদিন কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। হয়ত বাস্তবের উজ্জ্বল চিত্রপটে আলো আঁধারের লীলা তাকে এত মুগ্ধ করেছিল যে তিনি তার অন্তরালবর্তী রোমান্সের স্বপ্নপুরে প্রয়ান করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

'সধবার একাদশী প্রহসনে দীনবন্ধু মধুসূদনের মতই নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়ের উৎশৃঙ্খলতা ও ব্যভিচার বিনষ্টিকে বিদ্রুপাঘাত করেছে। অনেকে বলেন নিমচাঁদ মাইকেল মধুসূদনের চরিত্র অবলম্বনে লিখীত হয়েছে। নাট্যকার এসকল কতা অস্বীকার করলেও নিমচাঁদের সংলাপে মধুসূদনের বাচনভঙ্গির অনুকরণ আছে। মধুসূদন একদিন ভূদেববাবুকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই কথা প্রতিধ্বনি করে নিমচাঁদ বলেছেন–

''I read English, Write English, talk English,
Speechity in English, think in English, and dream in English.''

কিন্তু এটুকু ছাড়া একটি আনুপূর্বিক চরিত্র গড়ে তোলার যে যোগ্যতা নাটকীয় চরিত্রকে সম্পূর্ণতা দেয়, দীনবন্ধুর তা ছিল বটে, মোটা দাগের ভাঁড়ামিতে রূপান্তরিত হয়েছে এই চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীকার করেছেন যে, 'ইহা বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে।'

''বিয়ে পাগলা বুড়ো'' নিখুঁত হাস্যরস প্রধান প্রহসন হিসেবে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এই প্রহসনে একটি বৃদ্ধ তার কন্যা দৌহিত্র প্রভৃতি রেখে গোপনে অসহায় বালিকাকে বিবাহকরতে গিয়ে কিরূপ নাকাল হয়েছিল পাড়ার ছেলেদের হাতে তারই কৌতুক চিত্র প্রদর্শিত। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' একই বিষয়কে নিয়ে পূর্বেই রচিত হয়েছিল। যেহেতু দীনবন্ধুর মধ্যে কৌতুক রসের স্বাভাবিক আকর্ষন ছিল তাই সমালোচক বলেন, দীনবন্ধু এখানে স্বক্ষেত্রে াবস্থিত। অতএব সাবলীল।

'জামাই বারিক' একটি সামাজিক প্রহসন। এর কাহিনীতেও বাস্তবের ছায়া আছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন। একদিকে ধনীগৃহে অলস জামাত পোষণ অন্যদিকে একাধিক বিবাহিত কুলীন ব্রাহ্মণের জীবনে সতীন কোন্দল জনিত বিভ্রাটের কৌতুকল চিত্র এটি। এখানে দীনবন্ধু স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত। পারিবারিক জীবনবিধের প্রতি পরিণামী মমতাবোধও এখানে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন।

'লীলাবতী' দীনবন্ধুর একি নাট্যচিত্র। এক অসৎ চরিত্র নেশাখোর কুলীন পাতত্র সাথে একটি শিক্ষিত মেয়ের বিবাহ বিভ্রাট' লীলাবতী নাটকের বিষযবস্তু। সমালোচক বলেন, কয়েকটি সরল পার্শ্বচরিত্র ছাড়া এই নাটকের আর তেমন কিছু শিল্প উত্তরণ ঘটেনি।

নাট্যকার দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা বিচারে একদিকে যেমন তাঁর রচিত নাটকগুলির শিল্প সাফল্যের দিক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, তেমনি বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর অবদানও বিবেচনা সাপেক্ষ। এ উদ্দেশ্যে শ্রী গিরীশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধু মিত্রকে তার 'শাস্তি কি শান্তি' নাটক উৎসর্গ করতে গিয়ে যে কথা বলেছিলেন তার উদ্ধার প্রয়োজন।

''যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনীত হয়, সেই সময়
ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করতা এক প্রকার
অসম্ভব হইত। কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতির যে রূপ ব্যায় হইত।
তাহা নির্বাহ করা সাধারনের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু
আপনার সমাজচরিত্র 'সধবার একাদশীঃতে অর্থ ব্যয়ের
প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া
'সধবার একাদশর্শী' করিতে সক্ষম হত। মহাকালের নাটক
যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন
করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়
স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।।''

৩। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ **৬ x ৪ =২৪**

ক) কবি মুকুন্দের কবিকৃতির ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিন।

উত্তর ঃ-বিদ্যাপতি উত্তর বিহারের দ্বারভাঙা জেলার মধুবনি মহকুমার অন্তর্গত 'বিষকি' নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গণপতি এবং পদবি ছিল ঠাকুর। লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় হরপতি, নরপতি ও বাচ্যপতি নামে তিনটি পুত্র এবং দুলহা নামে একটি কন্যা ছিল। এছাড়া তার পুত্রবধু চন্দ্রকলা কবিত্বখ্যাতি লাভ করেছিল।

কাব্যপরিচয়ঃ- বিদ্যাপতির লেখা কাব্যগ্রন্থগুলি হল,–

(ক) ভূ-পরিক্রমা (আনুমানিক ১৪০০ খ্রীঃ) এখানে কবি মিথিলা থেকে নৈমিষারণ্য পর্যন্ত যাবতীয় তীর্থের বর্ণনা

AMBITION Edition 2017

দিয়েছেন।

(খ) 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা', 'কীর্তিবিলাস' (আনুমানিক ১৪১০ খ্রীঃ) এই কাব্য তিনটিতে কবি রাজা কীর্তিসিংহের বীরত্ব ও প্রণয় কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

(গ) 'পুরুষপরিক্ষা' (আনুমানিক ১৪১০ খ্রীঃ) এটি মাহারাজা শিব সিংহের আমলে রচিত। এতে নানা ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক কাহিনী আছে।

(ঘ) লিখনাবলী (আনুমানিক ১৪১৮ খ্রীঃ) এই কাব্যটির বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।

(ঙ) 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী', 'শম্ভুবাক্যাবলী', 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী' এই চারটি কাব্য ১৪৪০-১৪৬০ খ্রীঃ মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

পদপরিচয়ঃ- রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনার জন্যই বিদ্যাপতি 'মৈথিল কোকিল' বা 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাতিলাভ করেন।তাঁর এই শ্রেণীর পদের সংখ্যা প্রায় ৫০০টি। এগুলি সবই 'ব্রজবুলি' ভাষায় রচিত। তিনি মূলত অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, রাধার বয়ঃসন্ধি মান, মাথুর, ভাব সম্মিলন ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের পদরচনা করেছেন। ব্রজবুলি ভাষা, ছন্দ ধ্বনিমাধুর্য্য, ভারকল্পনা, প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সমন্বয়ে তাঁর পদাবলী অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। যেমন–

(১) 'প্রার্থনা বিষয়ক' পদে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় আছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়', 'অতল সৈকত বারি বিন্দুসম' প্রভৃতি পদগুলি উল্লেখযোগ্য।

(২) রাধার প্রথম যৌবনের ভয়মিশ্রিত কৌতুক ও চিত্ত চাঞ্চল্যকে ফুটিয়ে তুলতে বিদ্যাপতি যেভাবে চিত্রের পর চিত্র সাজিয়েছেন তা আর কোনো কবির পদে নাই। 'খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঙ্গ', 'জহাঁ জহাঁ জলকত অন্দ'

(৩) পূর্বরাগের পদেও রূপানুরাগ প্রবল। কবি যেন নিজেই রাধার রূপ দর্শন করেই কৃষ্ণের জবানিতে বলেছেন,– ''যব গোধুলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির গেলি / ঠির বিজুরী নবীনা গৌরি দ্বন্দে পসারি গেলি।

(৪) 'মাথুর' এর পদ রচনাতে বিদ্যাপতির সমতুল্য বৈষ্ণবকবি আর নাই। এ প্রসঙ্গে তাঁর এ সখি 'হামারি দুখের নাহি ওর' 'অঙ্কুর তপন যদিজারব' প্রভৃতি পদগুলি উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাপতি প্রায় সব রস পর্যায়ে পদ লিখেছেন এবং সব ক্ষেত্রেই রূপানুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। শব্দের আশ্রয়ে প্রতীক বা চিত্র রচনাতে কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের পটভূমিতে পজঝটিকা, দোহা, চর্চরি, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ পদ রচনা করে তিনি ছন্দবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। আবার তাঁর অর্থালংকারের ব্যবহার ও ঈর্শনীয় হয়েছে। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষায় কোন পদরচনা করেননি। তবু পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব এবং তার ভাবনার সঙ্গে বাঙালির ঘনিষ্ঠ যোগের কারণে তাকে বাংলা সাহিত্যের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিচিত্র পরিবেশে সৌন্দর্যকে উপভোগ করে তাকে নানা রূপে ও রসে প্রকাশ করাকেই বিদ্যাপতির কৃতিত্ব।

গ) শাক্ত পদসাহিত্যে কবি কমলাকান্ত-র স্থান নির্ণয় করুন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি হলেন কমলাকান্ত চক্রবর্তী। তিনি বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অম্বিকা নগরবাসী ছিলেন। তিনি নিজে ভক্তসাধক ছিলেন। রামপ্রসাদের কবিতার প্রভাবে তিনি প্রভাবিত হলেও তাঁর পদগুলিতে আন্তরিকতার সুর ধ্বননিত হয়েছে। তার অলৌকিক জীবনকথা রামপ্রসাদের মতোই সমাজজীবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাল্যকালে টোলে পড়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ করেন।

কমলাকান্ত প্রথম জীবনে সাধকরঞ্জন নামে একখানি তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ রচনা করেন। এতে কবির সামান্য আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। স্থানীয় মন্দিরে টোল খুলে ছাত্রদের সংস্কৃত পড়াতেন এবং সময় সুযোগে শ্যামাসংগীত রচনা করতেন। শ্যামাসংগীত রচনার জন্য বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্ত স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কবিপ্রতিভাঃ- শাক্ত পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে 'আগমনী ও বিজয়া' অংশের গানগুলিই কবিকে অমর করে রেখেছে।

(ক) এ অংশে কন্যার বিচ্ছেদ-বেদনাদগ্ধ মা মেনকার হৃদবেদনা কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখো হেরি,
অভাগিনী মায়রে বধিয়া কোথা যাওগো।''

(খ) জামাতা শিবের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মেনকা গিরিজাকে বলেছেন,–

''শুনেছি নারদের ঠাঁই গায়ে মাখে চিতা ছাই।
ভূষণ ভীষণভাবে গলে ফনীহার।।
একথা কহিব কায়, সুধা ত্যাজিবিষ খায়।
কহ দেখি এ কোন বিচার।।''

AMBITION
Edition 2017

(গ) কন্যাউমাকে গিরিপুরে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে কৈলাস পথযাত্রী গিরিরাজের দোলাচল চিত্ততা সম্পর্কে কবি লিখেছেন–

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে,
হরিষে-বিষাদে প্রমোদ প্রমাদে
ক্ষণে দ্রুত, ক্ষণে চলে ধীরে।।

(ঘ) উমা ও শিবের পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে মেনকা জানিয়েছেন,–

বরঞ্চ ত্যাজিয়ো মনি ক্ষনেক বাঁচিয়ো ফনী।
ততধিক শুলপাণি ভাবে উমা - মা - রে।।
তিলেক না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদিপরে।
সে কেন পাঠাবে তারে সরল অন্তরে।।''

AMBITION

কমলাকান্তের এই জাতীয় পদগুলি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক লিরিক কবিতার লক্ষণাকান্ত। সুনির্বাচিত শব্দ ব্যবহার, অলংকার প্রয়োগ, গভীর ভাবের উপস্থাপনা কবিপ্রাণের সৌন্দর্য্যবোধ ইত্যাদি কমলাকান্তের পদাবলীকে প্রকৃতই গীতি কবিতার সৌন্দর্যই পূর্ণ করেছেন।

রামপ্রসাদের মত কমলাকান্তের বৈষ্ণব ও শক্তিসাধনার মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলেছেন। রামপ্রসাদ লিখেছেন,–

'কালী হলি মা রাসবিহারী / নটবর বেশে বৃন্দাবনে'

অনুরূপভাবে কমলাকান্তও লিখেছেন,–

''বয়ে এল কেশী করে লয়ে আসি
দনুজ তনয়ে করে সভয়ে
কভু বুজপুরে আসে বাজাইয়ে বাঁশি
ব্রজাঙ্গনার হারিয়ে লয়।

কিন্তু শাক্তকবিরা বৈষ্ণব কবিদের মতো জ্ঞানশূন্যা ভক্তি কামনা করেন না। তারা ভক্তিকে আশ্রয় করে ব্রহ্মজ্ঞান কামানা করেন। তাই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ই তাদের একমাত্র লক্ষ। তাই কমলাকান্ত সুখে দুঃখে সমব্যাথী হয়ে লৌকিক বন্ধন থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত অবস্থায় গেয়ে ওঠেন,–

''রেন কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেলো।
দেখো, সুখ দুঃখ সমান হল, আনন্দ সাগর উথলে।।''

পরিশেষে বলা যায় যে, কমলাকান্তের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন,–

'রামপ্রসাদ সিদ্ধির যে উর্দ্ধস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কমলাকান্ত হয়ত ততদূর পৌঁছাতে পারেন নাই'

সমালোচকদের এই মন্তব্য স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, সাধনার বিভিন্ন স্তরে থাকে এবং কোন সাধক সাধনার কোন স্তরে পৌঁছেছেন তা বাইরে থেকে বলা বড় কঠিন। সেই বিচারে কমলাকান্তের কবি প্রতিভাকে কোন ভাবে ছোট করে দেখবার উপায় নেই।

চ) শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারাগুলি কী কী, উল্লেখ করুন।

উত্তর ঃ- ভাষার দুটি দিক হচ্ছে ঃ তার বাইরের প্রকাশ রূপ এবং তার ভিতরের ভাব বা অর্থ। ভাষা বিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার এই অরআত সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে শব্দার্থ বা Semanties বলে।

বাংলা ভাষার শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন–

১। অর্থ বিস্তার বা অর্থ প্রসার
২। অর্থ সংকোচ
৩। অর্থ সংক্রম বা অর্ত সংশ্লেচ।

Edition 2017

অর্থ বিস্তার - যদি কোন শব্দ প্রথমে কোন সংকীর্ণ ভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে ব্যাপক ভাব বা অধিকতর বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে অরআত বিস্তার বা অর্ত প্রসার বলা হয়। সাধারণত রূপক বা অতিশয়োক্তির জন্যে এরকম অরআত বিস্তার ঘটে তাকে। যেমন াগে সংস্কৃত 'বর্ষ' শব্দের অরআত ছিল 'বর্ষাকাল' অরআতাৎ বৎসরের একটি মাত্র অংশ। পরে শব্দটি বৎসরের একটি মাত্র অংশ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে সারা বৎসর অর্থেই ব্যবহৃত হতে তাকে। এখানে 'বর্ষ' শব্দের বিস্তার ঘটেছে। তেমনি সংস্কৃতে 'পরশ্ব' শব্দের অর্থ আগে ছিল আগামীকালের পরের দিন। (ভবিষ্যৎ কাল)। এই শব্দ তেকে বাংলায় এসেছে পরশু কিন্তু এর মানে এখন হয়েছে 'আগামী কালের পরের দিন' ও 'গতকালের াগের দিন' অর্থাৎ যা শুধু ভবিষ্যকালের অর্ত বোজাতে তা এখন ভবিষ্যৎ ও অতিত দুই ক্ষেপে ব্যবহৃত হয়। এখানে 'পরশু' শব্দের ার্ত বিস্তার ঘটেছে। এরূপ কালি, মীরজাফর

প্রভৃতি শব্দের ও অর্থ বিস্তার ঘটেছে।

অর্থ সংকোচ ঃ- প্রথমে কোন শব্দের অর্থ যদি একাধিক বা ব্যাপক বাবকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে যদি তার অর্থ একাধিক বস্তু বা ব্যাপক ভাবকে না বুঝিয়ে তার মধ্যে একটি মাত্র ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে শব্দের অর্থ বলে। যেমন–সংস্কৃতে প্রথমে প্রদীপ শব্দের অর্ত ছিল সব রকমের আলো। পরে বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় সব রকমের আলো নয়, একটি বিশেশ রকমের আলো যা পিতল বা মাটির তৈরী এবং যা তেল ও সলতে সংযোগে আলো দান করে। এখানে প্রদীপ শব্দের অর্থসংকোচ হয়েছে। 'মনুষ্য' থেকে বাংলায় আগত 'মুসিন' শব্দের অর্থ সর্বশ্রেণির মানুষ নয়, শুধুই মজুর।

অর্থ সংক্রম ঃ- শব্দের অর্থ পরিবর্তন কতকগুলি ধাপের মধ্য দিয়ে হয়। অনেক সময় অর্ত পরিবর্তন হতে হতে শেষ দাপে এসে শব্দের এমন নতুন অরআত দাঁড়িয়ে যায় যে মূল অর্থের সাথে তার যোগ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন মনে হয় শব্দটির অরআত এক বস্তু থেকে একেবারে অন বস্তুতে সরে এসেছে। এই ধরণের পরিবর্তনকে বলে অর্থ সংশ্লেষ বা অর্থ সংক্রমম। যেমন - সংস্কৃতে প্রথমে ঘর্ম বলতে বোঝাত গরম। এখন বাংলায় বোঝায় 'ঘাম' বা 'স্বেদ'। আরও সার্থক উদাহরণ হল পাত্র শব্দের অর্থ। সংস্কৃতে এর অর্থ ছিল 'পান করার আধার।' তাই তেকে অর্থ বিস্তারের ফলে মানে দাঁড়ায় যে কোন রকমের আধার। তাই থেকে অর্থ সংকোচের ফলে মানে দাঁড়ায় কন্যা দান করার আধার এখন সংকীর্ণ অর্থ হল এখানে মূল অর্থের সাথে বর্তমান বর্তমান অর্তের কোন যোগ নেই। তাই একে অর্ত সংক্রম বলতে পারি। এরূপ 'সন্দেশ', খবর, চামচে প্রভৃতি শব্দের উদাহরণ দেওয়া যায়।

অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি ঃ- উপরে উল্ললিখিত ধারাগুলি ছাড়াও শব্দার্থ পরিবর্তনের আরো দুটি ধারার কথা কেও কেউ উল্লেখ করেছেন। সে দুটি হল অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি।

কোন শব্দের ার্থ যদি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে শব্দটিতে প্রথমে যে বাব বা বস্তুকে বোঝাত তার চেয়ে সম্মানিত বা আদৃত ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তা হলে তাকে অর্থোন্নতি বলে যেমন 'বাতুল' শব্দের মূল অর্থ বায়ুগ্রস্ত, উন্মাদ, পাগল। কিন্তু বাতুল থেকে াগত বাউল শব্দের অর্থ বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়। তেমনি ভোগ, প্রভৃতি শব্দের অর্থান্নতি ঘটেছে।

আবার কোন শব্দের অর্ত পরিবর্তনের ফলে যদি এমন হয় যে, শব্দটিতে পূর্বাপেক্ষ হেয় বা তুচ্ছ বিষয়কে বোঝাচ্ছে তাকে বলে অর্থাবনতি। যেমন মহাজন আগে ছিল 'মহৎ ব্যক্তি, এখন বোঝায় ঋণ ব্যবসায়ীকে। তেমনি মনুষ্য > মুনিষ, শ্যালক > শাল প্রভৃতি ক্ষেত্রে ও অর্থাবনতি ঘটেছে।

ছ) বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহর গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

উত্তর ঃ-ইংরেজী ১৮০০সাল থেকে ১৯১৪ সাল অর্থাৎ একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে মাধুরীতির অবিসংবাহিত প্রতিষ্ঠা থাকলেও চলিতরীতিতে গদ্য রচনার চেষ্টা অল্প হলেও পাশাপাশি চলেছে। সেই সঙ্গে এ সংক্রান্ত বিবাদ-বিতর্কও। ফোর্ট উইলিয়া কলেজে যাঁরা লেখক ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। এদের মধ্যে রামরা বসু এবং উইলিয়ম কেরি মুখের ভাষাকে গদ্যে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। প্রথম জনের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং দ্বিতীয়জনের 'কথোপকথন' এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য।

ভাষা বিষয়ে সচেতনতা এবং মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভা – প্যারীচাঁদের এই দুই বিশেষত্ব সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত ছিল যে – সেই সময় বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের হাতে যে ভাষা গড়ে উঠেছিল তা সুন্দর হলেও সর্বজনের বোধগম্য হয়ে উঠতে পারেনি। সেই সঙ্গে ছিল ইংরেজি অথবা সংস্কৃত গ্রন্থের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা। বাঙালি লেখকরা গতানুগতিকের বাইরে যাবার সাহস করতেন না। যে ভাষা প্রত্যেক বাঙালি বুঝতে পারে, ব্যবহার করে, তিনিই প্রথম তা তঁর বইয়ে প্রয়োগ করেন। ইংরেজি এবং সংস্কৃতের দ্বারস্থ না হয়ে 'স্বভাবের অনন্ত ভান্ডার' থেকেই নিজের রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখে প্যারীচাঁদ দুটি প্রয়োজনই সিদ্ধ করেন।

১৮৫৫ সালে প্যারীচাঁদ তার বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখার সঙ্গে সাধারণ বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন। এই পত্রিকাতেই তিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলেন – 'আলালের ঘরের দুলাল'

বঙ্কিমচন্দ্র এই বইয়ের কথাতেই বললেন যে, বাঙালির প্যারীচাঁদই প্রথম সার্থকভাবে প্রমাণ করলেন যে,– বাঙালির প্রতিদিনকার ব্যবহারের ভাষার বই লেখা যায়। এই ভাষা সুন্দর, সকলের কাছেই পৌঁছে যায়।

এ কথাও সর্বজনস্বীকৃত যে 'আলালের ঘরের দুলাল'এর ভাষা আদর্শ ভাষা নয়। কিন্তু এই বইয়ের দ্বারা প্রথম প্রমাণিত হল যে, কথ্যচলিতভাষা সংস্কৃতনির্ভর সাধুভাষার চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে 'আলালের ঘরের দুলাল'এর যে গুরুত্ব তা এই জন্যই। মুখের ভাষা ভঙ্গিকে আশ্রয় করে প্যারীচাঁদ সত্যিই সেদিন আশ্চর্য বাস্তবতায় কলকাতার নাগরিক জীবনকে ধরতে পেরেছিলেন। যেমন– 'রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে – কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে – গরু লইয়া চলিয়াছে – ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন – মেয়েরা ঘাটে সরি হইয়া পরস্পর মনের কথা কহিতেছে।'

AMBITION
Edition 2017

প্যারীচাঁদ আরও কিছু আখ্যান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা ঠিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন – 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)

'রামপঞ্জিকা' (১৮৬০) মেয়েদের জন্য সংলাপের ঢঙে লেখ। গল্পের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সে অত্যন্ত সামান্য। তাছাড়া রয়েছে নীতি উপদেশের আধিক্য।

'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) আখ্যানে ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন লেখক গল্পের আকারে।

'অভেদী' (১৮৭১) এবং 'আধ্যাতিতকতা' দুই রচনাই রূপকধর্মী উপন্যাস। সাহিত্যের ঐতিহাসিক সমালোচকদের বিবেচনায় আধ্যাত্ম-তাত্ত্বিক প্যারিচাঁদ বড় হয়ে উঠেছেন।

আধ্যাপক সুকুমার সেনের মতেঃ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদনের দান যেরকম, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের দান প্রায় সেইরকমই। প্যারীচাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের আগে বাংলা উপন্যাস বলতে সংস্কৃত, ফরাসি, উর্দু ও ইংরেজি থেকে নেওয়া গল্প কথা ও রোমাঞ্চ কাহিনীই বোঝাত। প্যারীচাঁদ সম্পর্কে সমালোচক রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন যে, নীরস ছাঁদে ও পান্ডিত্যপূর্ণ গদ্যে রচিত প্রচলিত রোমাঞ্চ কাহিনীর ঊষর অলংকার থেকে প্যারীচাঁদ বাংলা উপন্যাসের বীজ আলোকে এনেছেন।

AMBITION

কালীপ্রসন্ন সিংহ

খুব অল্প বয়স থেকেই ধনীর দুলাল কালীপ্রসন্ন নানারকম সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। একটিমাত্র বই লিখেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন। সেই বইটির নাম হল 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬৪)। শুধু মুখের কথার ভঙ্গি নয়, তাঁর ব্যবহৃত উৎসও লোকায়ত বাক রীতি। এই বইয়ে কোথাও সাধুরীতির অনুসরণ নেই।

হঠাৎ ফঁপে ওঠা, 'বাবু'দের বিচিত্রলীলা মহেশের রথযাত্রা থেকে আরম্ভ করে রেলের টিকিটবাবু – সবকিছুরই তির্যক বর্ণনা আমাদের সাহিত্যে প্রকৃতই অভিনব। আমাদের নাগরিক জীবনের বিচিত্র ব্যভিচার কালীপ্রসন্নের একেবারেই পছন্দ হয়নি বলে দুই খন্ডের এই নকশা। এতে তিনি প্রকৃতই সাহস এবং বাক-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। বাঙালির নীচতাকে সে সময় এভাবে কেউ আক্রমণ করতে পারেননি।

উদাহরণঃ

'এদিকে চড়কতলার টিনের খুরখুরি, টিনের মুহুরি দেওয়া তলতা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং করা বাঁখারীর চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তৈরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানাপ্রকার খেলনা, বিক্রি কত্তে বসেছে, ২ড়ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাডাং চিঙ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং।

প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষার সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষার একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম জন প্রধানত সাধুভাষাকেই ব্যবহার করেছিলেন। সেই সঙ্গে কলকাতার 'কক্‌নি' ভাষা এমনকি গদ্যভাষাও তিনি পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর সাধু-চলিতের মিশ্রণও ঘটেছে যথেচ্ছভাবে। অবশ্য এ ব্যাপারে ত্রুটি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। কালীপ্রসন্ন কিন্তুত সেদিক থেকে দেখলে পুরো কলকাতার চলিত ভাষাই ব্যবহার করেছেন, কোথাও সাধুভাষার সাথে মিশিয়ে ফেলেননি।

প্যারীচাঁদের সাথে হুতোমের সাদৃশ্যের দিকটিও বিশেষভাবে বলবার। সেটি হল, দুজনেই বাঙালি সমাজের উন্নতি চেয়েছিলেন। দুজনেই আমাদের সে সময়কার কদর্যতার নিন্দা করেছেন।

Edition 2017

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৬ ও জুন, ২০১৭

বাংলা (Bengali)

সহায়ক পাঠ্যক্রম (Subsidiary)

দ্বিতীয় পত্র (S-2) SBG-II : Chhando, Alonkar O Kabya-Kabita)

AMBITION

বিভাগ - ক

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ (অনধিক ৪০০শব্দে) — **২০ x ২ =২০**

ক) উদাহরণ সহ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতির ছন্দের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- ১। দলবৃত্ত ছন্দে সমস্ত রুদ্ধ দলের উচ্চারণ সংকুচিত হয়ে মুক্তদলের সমান হয়ে এক মাত্রার মার্যাদা পায়। কিন্তু যদি একটি মাত্র রুদ্ধ পংক্তির শেষে থাকে, তবে আমাদের উচ্চারণে সেটি প্রলম্বিত হয়ে দু'মাত্রার বা দুই দলের মর্যাদা পায়। যেমন -

সবাই হেথায় / একটা কোথাও / করতে হয় / ২ শেষ
গান থামিলে / তাইতো কানে / থাকে গানের / ২ রেশ
কাটলে বেলা সাধের খেলা / সমাপ্ত হয় / বলে
ভাবনাটি তার / মধুর থাকে / আুল অশ্রু / জলে

২। শুধু পংক্তির শেষ নয়, অনেক সময় পদের শেষেও রুদ্ধ দল দুটি মুক্ত দলের সমান পর্যাদা পেয়ে দু'মাত্রা হয়ে থাকে। যেমন -

১ ঠ ঠ ঠ ঠ ১ (২ দেশ) ১ ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ
একত্রে আছে / মজার (২ দেশ) সব রকমে / ভালো

১ ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ (২ দেশ) ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ
রাত্তিরেতে / বেজায় (২ দেশ) দিনে চাঁদের / আলো

উপরের উদাহরণটিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে , 'দেশ' ও 'রোদ' অতি অনায়াসেই দুই দলের কাজ রে যাচ্ছে বলে পড়ার মসয় আমাদের কানে খটকা লাগছে না।

তাই এখানে রুদ্ধদল দুই মাত্রা হয়ে উদাহরণভটির সর্বসময়ে তা বজায় রাখছে।

৩। এছাড়া কখনও কখনও মুক্ত দল ও দুই দলে কাজ করে। যেমন-

১ ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ ঠ ১ ঠ ১
কোন দেশেতে / তরুলতা / সকল দেশের / চাইতে শ্যামল ?=৪+৪+৪+৪

১ ঠ ঠ ঠ ১ ঠ ঠ ঠ ১ ১ ঠ ১ ঠ ঠ ১
কোন দেশেতে / চলতে গেলে / দলতে হয়রে / দূর্বা / কোমল ? = ৪+৪+৪+৪

১ ঠ ঠ ঠ ঠ ১ ১ ঠ ১ ঠ ঠ ঠ ঠ (২ রে ?)
কোথায় ফলে / সোনার ফসল / সোনা কমল / ফোটে =৪+৪+৪+৪

ঠ ঠ ঠ ঠ (২ দেশ) ঠ ঠ ১ ঠ ১ ঠ (২ রে ?)
সে আমাদের / বাংলা / আমাদেরই / বাংলা =৪+৪+৪+৪

Edition 2017

রীতি দলবৃত্ত : পর্ব-৩, পংক্তি-৪ ও চরণ-৪ মাত্রা, মাত্রা-৪, লয়-দ্রুত

মন্তব্য - উদাহরণটির শেষ পংক্তিতে বাংলাদেশের দেশ রুদ্ধদলটির উচ্চারণ প্রসারিত হয়ে দুই মাত্রার মূল্য পেয়ে এবং পর্ব সমতা বজায় রেখেছে। এছাড়াও শেষ দুটি লাইনে অন্তিমপর্বে 'রে' ও 'রে' এই দুটি মুক্ত দল উচ্চারণ প্রসারিত হয়ে দুই মাত্রার মূল্য পেয়েছে ও সর্ব সমতা বজায় রেখেছে তবে এ জাতীয় উদাহরণ বাংলা বিতায় খুব বেশী লক্ষ্য করা যায় না। আচার্য প্রবোধ চন্দ্র সেন বলেছেন দলবৃত্তের রীতিগুলিকে ব্যতিক্রম নবা বলে বিশেষ বিধি বলাই ভালো।

AMBITION

৪।(ক)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

আমার ঘরে / ছুটির বন্যা / তোমার লাফে / ঝাঁপে = ৪+৪+৪+৪

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

কাজ কর্ম / হিসাব কিতাব / থর থরিয়ে / কাঁপে = ৪+৪+৪+৪

খ)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২

রাত পোহালো / ফরসা হলো / ফুটল কত / ফুল =৪+৪+৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

কাঁ পিয়ে পাখা / নীল পতাকা / জুটল আলি / কুল = ৪+৪+৪+৪

দ্বিতীয় উদাহরণটির ২য় লাইনের প্রথম পর্বটি লক্ষ করলে দেখা যাচ্ছেযে পর্বটিতে পাঁচটি স্বরধ্বনি পওয়া যাচআচে ও স্বাভাবিক ভাবেই অমারা পাঁচ মাত্রা বলে গণ্য করছি। কিন্তু উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রলে দেখা যাচ্ছে যে, 'পিয়ে' দুটি অক্ষর নয় একটি অক্ষর (পিয়ে =পিএ = প+ই+এ) এখানে ই+এ মিলে একটি যৌগিক স্বরধ্বনি হয়েছে। প্রথমে উদাহরণে এর বিপরীত প্রমাণ লক্ষ করা যায়। যেখানে 'থরিয়ে' তিন অক্ষর হয়েছে, দুই অক্ষর হয়নি (থরিয়ে = থ+অ+র+ই+এ) এখানে ই+এ মিলে যৌগিক স্বর হলে দুই অক্ষর হত। দুতরাং, দেখা যাচ্ছে স্বরবৃত্তে বা দলবৃত্তে দ্রুতউচ্চারণের জন্য দুটি সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনি (বা দুটি অরক্ষ) সংযুক্ত হয়ে এজটি যৌগিক স্বরধ্বনিতে (বা একটি অক্ষরে) পরিণত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

গ) দেবী লক্ষ্মী ও মায়াদেবী মেঘনাধবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের মূল চালিকাশক্তি - এ সম্পর্কে আপনার অভিমত যুক্তিসহ লিখুন।

উত্তর ঃ- রাক্ষসরাজ রাবণকে ধ্বংস করার জন্য তাঁর আড়ালেই স্বর্গ-মর্ত্যে যে চক্রান্তজাল প্রসারিত হয়েছে, তাতে প্রধান অংশ নিয়েছেন রাক্ষসকুলের রাজলক্ষ্মী। গ্রীক মহাকবি হোমারের আদর্শ অনুসরণ করে কবি স্বর্গের দেব-দেবীকে লঙ্কাযুদ্ধে বিবদমান পক্ষে অবতীর্ণ করিয়েছেন। গ্রীক দেব দেবীর আদর্শে মেঘনাদবধ কাব্যের দেব চরিত্র পরিকল্পিত বলে এই সমস্ত দেব দেবীর চরিত্রগুলি মহিমাযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। পুরাতন বাংলা কাব্য সাহিত্যে যে সমস্ত লোকায়ত দেবতার ছবি আঁকা হয়েছে সেগুলিও অবশ্য খব উঁচু আদর্শ বা মানের নয়। কবি এইসব চরিত্রগুলির সাথে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। বিদেশী ভাবধারার দেব চরিত্রকে ভারতীয় কাব্যকাঠামোর মিশ্রিত করার ফলে হিন্দু দেবচরিত্রের আদর্শ নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। লক্ষ্মীদেবীর চরিত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রমাণিত।

Edition 2017

যেখানে বৈভবের অবকাশ লক্ষ্মী সেখানেই অবস্থান করেন, কারণ তিনি দারিদ্রের নন, সমৃদ্ধির দেবতা। পরাক্রান্ত বীর রাবণ পৃথিবীর সম্পদ আহরণ করে লঙ্কার ধনভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলেছেন। লক্ষ্মীদেবী তাই রাবণের পুরীতে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন। রাবণ তাঁর ভক্ত এবং সন্তানসদৃশ তাঁর মুখের দিকে চেয়েই এতকাল তিনি তাঁর স্বামীর বিরহবেদনা নীরবে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু এই রাবণের মধ্যে যখন তিনি অধর্মের, পাপের অভিভব প্রত্যক্ষ করলেন তখন এতকালের স্নেহমোহ লুপ্ত হবার উপক্রম হলো, পাপ লঙ্কাপুরী ছেড়ে যেতে উদ্যত হলেন। মরলাকে বলেওছেন দুর্মতি রাবণ দিন দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছেন, সেইহেতুই এ পুরী পরিতাগ করতে তাঁর এত চঞ্চলতা।

সরপতি ইন্দ্রকেও তিনি বলেছেন, নিজের কর্মদোষেই রাবণের মতো পাপী সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, তবুও তাঁকে তিনি শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে করে উঠতে পারছেন না।

সন্তানের মধ্যে যদি কোনো অন্যায় মানসিকতা প্রকাশ পায় তাহলে জননীর অন্তরে বেনার্ত হবে– এটাই অতন্ত স্বাভাবিক। জননী তখন ক্রুদ্ধও হতে পারেন। এমনকি তিনি তাঁর সন্তানকে নিজের সেই সীমাহীন মমত্ববোধ থেকেও বঞ্চিত করতে পারেন। জননী যেটি পারেন না, তা হলো সন্তানের অমঙ্গলচিন্তা বা বিনাশকামনা। মানবী জননীর পক্ষে যা সম্ভব নয় তাই সম্ভব হয়েছে দেবী লক্ষ্মীর পক্ষে। সুরপতিকে তিনি বলেছেন রাবণ যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন তাঁর ঘরে তিনি বাধা থাকবেন। এর নিহিতার্থ হলো, যতো শীঘ্র রাবণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক তাহলে তাঁর পক্ষে লঙ্কাপুরী ত্যাগ করার ব্যাপারটি সহজ হয়ে উঠবে। লক্ষ্মীর এই নিষ্ঠুরতা, প্রতিশোধস্পৃহা বা ভক্তের প্রতি একধরণের বিশ্বাসঘাতকতা পাঠকের মনে স্বতঃই অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করে। রাবণের প্রতি বিভীষণের বিরূপতা বা বিশ্বাসঘাতকতা তবু ক্ষমরা যোগ্য- কারণ তিনি দেবতা নন। লক্ষ্মীদেবী দেবতা হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাসহন্ত্রী রাবণের মতো অকপট বিশ্বাসী ভক্তের ভক্তির তিনি যোগ্য নন।

পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি সাধারণভাবে যে সমস্ত দেবদেবীর চরিত্র কল্পনা করেছে সাধারণভাবে তারা সকলেই মানবিক গুণসমৃদ্ধ। মধুসূদন কল্পনাকে এভাবে পুরাণের বাঁধাবাধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। ঐতিহ্যাশ্রয়ী কাব্যকলার তিনি সংস্কারেরও পক্ষপাতী ছিলেন। তাই গ্রীক এবং হিন্দু এই দুই বিপরীতমুখী ভাবাদর্শ মিশ্রিত করতে গিয়ে তিনি ঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। ফলে ইন্দ্র হয়ে উঠেছেন এক অমার্জনীয় কাপুরুষ, পার্বতী পক্ষপাতদুষ্ট এবং মহাদেব নির্দয়। লক্ষ্মীদেবী পরিণত হয়েছেন বিবেকশন্য পাষাণ প্রতিমায়। যে বীরত্ব বা পরাক্রম হোমারের দেব দেবীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়, মধুসূদনের চরিত্র কল্পনায় তারও প্রকাশ নেই। সকলেই যেন মেঘনাদের ভয়ে ত্রস্ত। এই প্রেক্ষিতে দেখলে তাঁর দেবচরিত্র পরিকল্পনা হোমারের থেকে অবশ্যই নিকৃষ্ট।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন (অনধিক ৩০০ শব্দে)ঃ **১২ x ৩ =৩৬**

ক) যে কোনো চারটি শব্দালঙ্কারের উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখুন।

উত্তর ঃ- অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টির নাম হল শব্দ। যে অলংকার ধ্বনির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং শ্রুতিসৌকর্য্য বিদায়ক তাকেই বলা হয় শব্দালংকার। এ অলংকার একান্তবাবেই ধ্বনির সৌন্দর্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই শব্দের পরিবর্তনের ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে বলে শব্দালংকারের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে এবাবে চিহ্নিত করতে পারি –

ক) কাব্যের বাইরের সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়ে দেয় শব্দালংকার।

খ) ধ্বনি ধ্বনিই শব্দালংকারের একমাত্র উপাদান।

গ) শব্দালংকারের ব্যবহৃত ধ্বনি মূলতঃ চার রকমের। যথা- বর্ণ ধ্বনি, শব্দ ধ্বনি, পদ ধ্বনি, বাক্য ধ্বনি।

ঘ) শব্দালংকারের কাব্যের অন্তসৌন্দর্য্যের প্রকাশ নাও হতে পারে। কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার আবেদন কানের কাছে। তবে তা মাঝে মাঝে মনকেও ছুঁয়ে যায়।

ঙ) এউ অলংকারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হল- কখনও কোনোভাবে এর শব্দকে বদল করা যায় না। যেমন - বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানি।–এই লাইনটি 'বাঘের' ও 'মাঘের' শব্দ দুটিতে একই রকম ধ্বনি সৃষ্টি হওয়ায় এটি শ্রুতিমুখর হয়ে উঠেছে। মাঘের পরিবর্তে শীতের শব্দটি যদি প্রয়োগ করা হয় তবে তাতে শ্রুতিসৌকর্য্য থাকে না। এবং অলংকারও বিনষ্ট হয়।

শব্দালংকারের অন্তর্গত একটি অলংার হল শ্লেষ অলংকার।

শ্লেষ অলংকার : সাহিত্য দর্পণে বলা হয়েছে, 'শ্লিষ্টৈঃ পদৈরনেকাথাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে' অর্থাৎ শ্লিষ্ট পদসমূহের দ্বারা (যুগপৎ অনেকার্থবোধক পদ সমূহের দ্বারা) অনেক অর্থের প্রকাশ হলে তাকেই শ্লেষ বলে।

অন্যবাবে বলা যায় যে, একই শব্দ যখন বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে পাঠক বিভিন্ন অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণ করবেন, তখনই হয শব্দশ্লেষ অলংকার। একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টিকে বোঝাতে পারি।

AMBITION
Edition 2017

'কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরারে
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।'

উপরোক্ত উদাহরটিতে প্রথমত এর অর্ত হল ভগবান গুপ্ত নন, তিনি চরাচরের সর্বত্র ব্যপ্ত। তাঁর দীপ্তিতে সূর্য (প্রভাকর) দীপ্যমান।

দ্বিতীয় অর্থটি হল– কবি ঈশ্বরগুপ্ত অপরিচিত নন। তিনি প্রভাকর পত্রিকা প্রকাশ করে সকলের কাছেই পরিচিত হয়েছে। বাক্যটিকে আর একটু স্বচ্ছ করলে বোঝা যায় যে, এখানে ঈশ্বর, গুপ্ত, প্রভাকর শব্দগুলি কেবলমাত্র একবারই ববহৃত হয়েছে কিন্তু ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। যথা-

শব্দ	প্রথম অর্থ	দ্বিতীয় অর্থ
ঈশ্বর	কবি ঈশ্বরগুপ্ত	ভগবান
গুপ্ত	অকেজো	লুকায়িত
প্রভাকর	ঈশ্বগুপ্ত সম্পাদিত বিশেষ পত্রিকা	সূর্য

সুতরাং, লক্ষ্য করছি যে, প্রথম অর্থটি দাঁড়াচ্ছে, কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত অজ্ঞাত ব্যক্তি ? তিনি সর্বত্র পরিচিত ব্যক্তি।

তাঁর কর্মদক্ষতা বা প্রতিভা বলে সংবাদ প্রভাকর নামক পত্রিকাটি সর্বজল পরিচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থটি দাঁড়াচ্ছে এই যে, কে বলে ভগবান লুকিয়ে থাকেন ? তিনি সর্বত্র অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁরই দীপ্তিতে সূর্য দীপ্ত পাচ্ছে। সুতরাং, এটি শ্লেষ অলংকারে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্লেষ অলংকারকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) সভঙ্গ শ্লেষ, (খ) অভঙ্গ শ্লেষ।

যকম-

একটি শব্দ কিংবা এক রকমের উাচ্চারিত শব্দ যদি বাক্যের মধ্যে দু'বার বা তারও বেশিবার বসে এবং একাধিক অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে বলে যমক অলংকার। যেমন -

(১) ভারত, ভারত খ্যাত আপনার গুণে —

(ভারতচন্দ্র)

প্রথম 'ভারত' শব্দটি বলতে আমরা বুঝি কবি ভারতচন্দ্র এবং দ্বিতীয় 'ভারত' বলতে বুঝি আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। 'ভারত' শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং দু'রকম অর্থ প্রকাশ করছে। তাই এটি যমক অলংকার।

(২) ঘন বনতলে এসো ঘন নীলবসনা - রবীন্দ্রনাথ প্রথম 'ঘন' শব্দটির অর্থ গভীর, দ্বিতীয় ঘন শব্দটির অর্থ গাঢ়। এখানে 'ঘন' শব্দটি দুবার বসেছে এবং দুরকম অর্থ করেছে। তাই এটি যমক অলংকার।

যমকের শ্রেণিবিভাগ

আদি মধ্য অন্ত্য সর্ব

যমক চার প্রকার ঃ
(১) আদ্য যমক
(২) মধ্য যমক
(৩) অন্ত্য যমক
(৪) সর্ব যমক।

খ) আপনার পাঠ্য পদ অবলম্বনে কবি গোবিন্দদাসের কবিকৃতিত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- চতুর্থ অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্যের পর নাটকের 'যবনিকা ' পাত ঘটেছে। এটিই শেষ দৃশ্য। এ দৃশ্যের পটভূমিকা 'মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ন প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা। পরিবেশ কলহাস্যমুখর নবান্ন উৎসব চলছে। মোরগের লড়াই, লাঠি খেলা ও কৃষানীদের গানে মুখরিত সমগ্র অঞ্চল।' তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে

AMBITION
Edition 2017

অকস্মাৎ 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার 'মাথা নাড়তে ' প্রবেশ করে। এমনাড়তেভাবে প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে য দুর্যোগের ঘনঘটার সূচনা, পরে বিস্তার, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদ, শেষ দৃশ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন এবং সেই সঙ্গে দয়ালের বক্তব্য মন্বন্তরের দাপট গিয়েছে, তবু মরিনি....আমরা এবার আর আকাল এসে আত্মীয় পরিজন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেনা।

শ্রীরঙ্গন মঞ্চে একাদিক্রমে সাত রাত্রি অভিনয়ের পর 'নবান্ন' নাট্যামোদী, বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল সাড়া ফেলেছিল।

নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার দিক থেকে 'নবান্ন' যতটা অভিনন্দিত হয়েছে, সাহিত্য হিসাবে নাটকটি ততটা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এর ঘটনা পরম্পরা একটি অখন্ড কাহিনীর ক্রমবিকশিত রূপকে তুলে ধরার চেয়ে ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি ও আবেগ বৈচিত্র্যের প্রতি বেশি মনোযোগী। সাধারন মানুষের সমাজজীবন অবলম্বন হলেও তাকে নাট্যরসাশ্রিত করার জন্য যে প্রতিভার প্রয়োজন, সে পরিচয় নাটকটিতে পরিস্ফুট হয়নি। তাই নবান্নের কোনো দৃশ্য পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাই কেউ কেউ শেষ দৃশ্যটিকে নবান্নের দুর্বলতম অংশ বলে মনে করেন।

সমালোচকের বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট যে, নাটকটির প্রথমাংশে গ্রাম-বাঙলার জনজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও তৎসহ নাট্য কাহিনীতে একটি গতিবেগ আনবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

চার অঙ্গে বিন্যস্ত 'নবান্ন নাটক বঙ্গদেশের অনাদৃত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রথম আলেখ্য। প্রথম বাংলার চাষী মজুরের 'দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সংকল্পের চমৎকার বাস্তব সম্মত চিত্র।' এর পটভূমিতে আছে তৎকালের বাংলাদেশের তিন বৎসরের ঘটনা, গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রতিপাদ্যটি তুলে ধরবার জন্য প্রাথমিক ভাবে দুর্গত পল্লী ও পল্লীবাসীর সংকটের স্বরুপ তুলে ধরেছেন।

প্রথম দৃশ্যের পটভূমি ঃ বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ আর এখানে ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলন দেশব্যাপী অগণিত মানুষের সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রক্তাক্ত সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনাকে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন। সুদুরের পটভূমিরক্তিম।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দৃশ্য প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালীর বিস্তৃত বর্ণনায় সমৃদ্ধ। অভাবের তাড়নায় সমাদ্দার পরিবার বীজধানের শেষে ঘরের থালা-বাসন বিক্রি করে মুখের গ্রাস সংগ্রহ করেছে। প্রতিবেশী দয়ালকে সংগৃহীত সামান্য খুদকুঁড়ো থেকে মুঠোখানেক দিতে দ্বিধা করেনা। নিরঞ্জন এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে, কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। প্রধানের দোচালা ভেঙে ঘর বার সব একাকার হয়ে যায়। হারু দত্ত গ্রামের মহাজন, সমাদ্দারদের অভাবের সুযোগ নিয়ে জমি কাড়তে উদ্যত হলে, কুঞ্জ বাধা দেয়।

গ) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কৃত্তিবাসের সার্থকতা আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- কৃত্তিবাস অনুবাদ করেছিলেন বাল্মীকির মহাকাব্য। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে আপন সৃষ্টি কার্যের ক্ষেত্রে কবি মহাকাব্যিক আদর্শকে অনুসরণ করেননি। সমগ্র ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক ধরে বঙ্গদেশীয় পাঠান রাজত্বের কালে সামাকি কাঠামোতে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে দেশবাসীকে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই সময়ে বাংলা ভাষায় রামায়ন, মহাভারত, ভাগবৎ ইত্যাদি সংস্কৃত কাব্যগুলিকে অনুবাদ করার প্রেরণা জাগে। লোক হিতৈষণার এই উদ্দেশ্য কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে সক্রিয় ছিল। কাব্য মধ্যে সে কথা সমানভাবে উল্লেখ করেছেন—

''সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।''

-তাই কৃত্তিবাস রামায়ন কাহিনীকে মহাকাব্যের রূপাঙ্গিকের পরিবর্তে পরিবেশন করলেন পাঞ্চালীর আঙ্গিকে, এর ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালির সাথে কৃত্তিবাসের কাব্যের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। আর লোক হিতৈষণার এই বিষয়টিকে কাব্য রচনার উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহন করার ফলেই কৃত্তিবাসের পাঁচালীতে এমন কিছু বিশিষ্টতা দেখা গেল যাতে বাল্মীকির মহাকাব্য থেকে এর সতন্ত্রতা যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি তাতে কৃত্তিবাসের কবি কৃতিত্বের মৌলিক লক্ষণগুলিও পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। অর্থাৎ বাল্মীকি রামায়ণের কাঠামোটিকে বজায় রেখে,

AMBITION Edition 2017

কবি নিজের মতো করে রামায়ণ কথা রচনা করেছেন। তার কাব্যের সাতটি কাণ্ড হল–'আদি', 'অযোধ্যা', 'অরণ্য', কিষ্কিন্ধ্যা', 'সুন্দর', 'লঙ্কা', ও 'উত্তরাকাণ্ড'। তার কাব্যের বৈশিষ্ট তথা জনপ্রিয়তার কারণগুলি হল নিম্নরূপ—

১। কৃত্তিবাসের পাঁচালী কাব্যটি একান্তরূপেই ভাবানুবাদ। বাল্মীকিকে আন্তরিকবাবে অনুসরণ করার কোন ইচ্ছাই কবির ছিল না। তার ফলে বাল্মীকি মূল কাহিনির দারাকে অখুন্ন রেখেও কৃত্তিবাস কাহিনির মধ্যে অনেক নতুন ঘটনার যেমন অবতারণা করেছেন তেমনি মূল কাহিনির কিছু কিছু অংশকে পরিত্যাগও করেছেন। মেঘনাদের সাথে যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা, বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে কালনেমির সাথে হনুমানের বিরোধ, লব-কুশের সাথে তিন ভ্রাতা সহ রামের মৃত্যু এবং বাল্মীকি কর্তৃক পুণর্জীবন লাভ, তরণী সেনের কাহিনী, বীরবাহু কথা, মহীরাবণ অহীরাবণ কথা, হনুমান কর্তৃক কক্ষতলে দারণ, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ প্রভৃতি ঘটনাগুলি কৃত্তিবাসের কাহিনীতে সংযোজিত। বাল্মীকিতে এসব ঘটনার উল্লেখ নেই। অন্যদিকে, কার্তিকের জন্ম, বিশ্বামিত্রের কথা, বিশিষ্ট বিশ্বামিত্রের বিরোধ, অম্বরিশযজ্ঞ প্রভৃতি বাল্মীকিতে তাকলেও কৃত্তিবাস তার কাব্যে এসব ঘটনা গ্রহণ করেন নি।

২। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙালির জাতীয় জীবনে প্রভাব পড়েছে প্রত্যক্ষভাবে। সর্বভারতীয় রাম কথাকে কৃত্তিবাস একান্তরূপেই বাঙালির নিজস্ব কাব্য উপকরণ সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তার ফলে এখানে বাংলার পরিচিত গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি ও খাদ্যসম্ভারকে কবি দ্বিধাহীনভাবে ব্যবহার করেছেন।

৩। ঋষি ভরতদ্বাজ তার আশ্রমে রামচন্দ্রের বানর বাহিনীকে খেতে দিয়েছিলেন মতিচুর, মণ্ডা, সরুচাকলি, গুড়পিঠে, তালবড়া, ছানাবড়া, খাজা, জিলিপি, পাঁপড় ইত্যাদি এইসব খাবারের সাথে বাঙালির রসনা একাকার। সীতাদেবী লক্ষ্মণকে আমাদের ঘরের বধূর মতই রান্নাবান্না করে খাইয়েছেন–

''প্রথমেতে শাক্ দিয়ে ভোজন আরম্ভ
তারপরে সুপ আদি দিলেন সানন্দে
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
ক্রমে ক্রমে সবাকার করিল বিতরণ।।''

৪। কৃত্তিবাসের কাব্যে বাঙালীদের আচার বিচারের রূপ রেখাটিও ধরা পড়েছে। রামচন্দ্রের জন্মের পাঁচদিনে পাঁচটি, ছয়দিনে ষষ্টিপূজা, আট দিনে অষ্টমই, তেরোদিনে জননী সৌচন্ত, ছয়মাসে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি।

৫। চরিত্র চিত্রনে মূল রামায়ণের আদিম রুক্ষ স্বভাবের পরিবর্তিত করে কৃত্তিবাস তার কাব্যে মধ্যযুগীয় বাঙালি চরিত্রের নমনীয়তা ও তারল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৬। সবচেয়ে বড় কথা বাংলাদেশে রামভক্তির যে আদর্শটি গড়ে উঠেছিল কৃত্তিবাস তার কাব্যে সেই ভক্তিবাসকে যথাযোগ্য অঙ্কন করেছেন। এই ভক্তিবাদের কোন স্পর্শই বাল্মীকির কাব্যে ছিল না।

৭। কাব্যকৃতির এই বিশিষ্টতায় কৃত্তিবাসের কাব্য বাঙালির নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। শতশত বৎসর ধরে এই কাব্যের মুকুরেই বাঙালি তার নিজ মুখচ্ছবিকে দেখে আসছে। বাঙালির জাতীয় চেতনার সার্বিক রূপটি এই কাব্যে যতটা ধরা পড়েছে তা মধ্যযুগ কিংবা আধুনিক যুগের আর কোন কাব্যের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই আজও বাঙালির কাছে কৃত্তিবাসের আক্ষরিক অর্থে–''এ বঙ্গের অলংকার।''

চ) জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার মর্মবস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- প্রেমরে কবি বনলতা সেন। প্রেম আর প্রেমাস্পদা দুই-ই তার বিষয়। কবির যাবতীয় পূর্বতনী বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, অরুণিমা, শঙ্খমালা, রাঙা রাজকন্যারা ইতিহাসের ঘাটে ঘাটে জীবনযাপন আকাঙ্খার সব শ্রেয়সীতা সবাই যেন সঙ্কলিত হয়ে উঠেছে বনলতায়। সে যেন ক্রমোন্নতি লক্ষ্মী বা আফ্রোদিতে, অথবা ম্যুলাটে, জেন দুবাল (বদলিয়ারের শ্রেয়সী) অথবা বিয়াত্রিচে। বনলতার সৃষ্টি সেই রবিশালে। কবির পাশের বাড়ির সেই মেয়ে যার সাথে কবির দেখা হয়েছিল, লজ্জাররুন্ন মুখ নিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন বাঁশবাগানের পথে। হয়ত সে 'পো'-র হেলেন- যার ছিল Thy hyacinth hair the classic face. তার দেহরূপ কবির চিত্তে জাগিয়ে তুলেছিল আমন্ত্রণময় দ্বীপবেলা। বনলতার নির্মাণ নেপথ্যে হেলেনের মিশরীয় বীজের কিঞ্চিৎ ছায়া পাওয়া যায়। কবির ও বিশ্বাস ছিল,-

''কোন প্রেম কোন স্বপ্ন কোনদিন মৃত হয় না।''

প্রকৃতির ভুমিকায় প্রেমের উপস্থাপনা জীবনানন্দের অন্যান্য কাব্যেও দেখা গেছে। ক্ষণজীবী রমনীয়তার

AMBITION
Edition 2017

কবি দেখেছিলেন বিষাদ, অনুভব করেছিলেন নশ্বরতার বেদনা। একানে 'বনলতা সেন' কাব্যে প্রকৃতি, পৃথিবী– জীবনানন্দের কাছে হয়ে উঠেছে প্রশান্তি ও নিশ্চিতের কেন্দ্র। প্রেমের মরণ জয়ীতার বোধ পরিপুষ্ট হয়েছে ইতিহাস চেতনায় প্রেম হয়ে উঠেও প্রেয় অন্বিষ্টের এক হরিয়সী প্রতিমা, যাকে আমরা আবিস্কার করি হাজার বছর ধরে অন্বেষণের পরে 'সবুজ ঘাসের দেশে' আর পাখির মতো চোখে-র প্রত্যাশিত প্রশান্তির আশ্রয়ে। তাই কবিতাটিতে এক প্রকৃতি (নিসর্গ) অন্য প্রকৃতির (নারী) সাথে বাব সম্মিলনে অভেদাত্ম ও অভিন্নতায় হয়ে উঠেছে।

বনলতা সেন কবিতায় কবি জীবনের নৈরাশ্য রূপকে
ধরতে চাননি, চেয়েছেম জীবনের মেলবন্ধন ঘটাতে
.....

ভোগলিক চেতনা / ইতিহাস চেতনা / সমচেতনার অনুভভে পরাবস্তাব সৌন্দর্যময়তা :
জীবনানন্দ চেয়েছিলেন,–

''কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাস
চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।''

(কবিতার কথা / জীবনানন্দ দাশ)

আবহমান কালের মানব সমাজ এবং তার ঐহিক ও আত্মিক ইতিহাসধারার ক্রমবিকাশী অনুবর্তনের এই বোধই জীবনানন্দের কাব্যে ইতিহাস সচেতনতা রূপে উপস্থিত। বনলতা সেন যুগের কবির ইতিহাস বোধ সচেতন মনন উদ্ভাবসিত, যদিও তা সমাজ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে যন্ত্রনাদীর্ণ নয়। প্রতীক রচনা ও সিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত ছিল, কবিতার জনপ্রিয়তায় তা উপলব্ধি করা যায়। 'বনলতা সেন' কবিতাটিকে এই প্রতীক রূপ পরাবাস্তব ব্যঞ্জনায় পৌঁচে দিতে সাহায্য করেছেন। সক্রিয় ইতিহাসবোধ কবিতাটিকে যেমন পরিমণ্ডল রচনায় সহায়তা করেছে তেমনি আবার স্পষ্টভাবে ইতিহাসের নিগূঢ় ভাবসত্যে অভিষিক্ত করেছে। একথা সত্য যে, বিদীর্ণ ইতিহাস উপাদানের চয়ন রয়েছে এখানে। বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদিশা বা শ্রাবন্তীর কারুকার্যের উল্লেখ এ বিষয়ে যথার্থ। এর ফলে কবিতাটিতে একটি মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে এবং ভাববস্তুতে গভিরতা ও ব্যপ্তি এনে দিয়েছে হাজার বছর ধরে পথ হাঁটার পরিকল্পিত সার্থকতায় কবি এবং তাঁর পরবর্তী ব্যক্তিসত্তায় আশ্বস্ত হয়। কবিতার স্রষ্টা আবহমান মানবাত্মার সাথে একাত্ম হয়ে যান। কবির পথ হাঁটা দেশ কালের সীমারেখা অতিক্রম করে পরিব্যপ্ত। সিংহল সমুদ্র এবং মালয় সাগর গুড়ে পরিভ্রমণ, কোন দুস্তর দ্বীপের সজ্জান ভোগোলিক পরিবেশ জানিয়ে দিচ্ছে কারণ এসব এখনও বর্তমান। কবিতাটির রূপকল্পের গণ্ডীতে অন্বিষ্ট বনলতা সেন, ইতিহাসের পরিব্যপ্ত পটভূমিতে তা মানবের শাশ্বত আকাঙ্খার বস্তু। তাকে পাওয়া যায় আলো আঁধারি জগতের যে ছবিটি Impressionist। আর অন্ধকার বা আলোর আভাসময় স্মৃতিময় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের জগৎ Real and under -এর পরাবাস্তব ইশারার পরিচায়ক। 'বনলতা' সেহেতু 'সেন' পদবী প্রাপ্ত তাই eternal feminine-র সাথে বর্তমান বাস্তবত্ত যুক্ত হয়েছে। বনলতা এ কালের জন্য প্রশান্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। সমুদ্র এবং নাবিকের অনুষঙ্গ ব্যাকুল অথচ দিকভ্রান্ত অন্বেষণের ব্যঞ্জনা ঘণীভূত করেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের স্মারণে আসে কোলরীজের 'Ancient Marinar'-র গল্প।

জীবনানন্দের ইতিহাস চৈতন্য কবিতাটিকে সভ্যতা থেকে নব সভ্যতায় মানবের ক্লান্তিহীন যাত্রা ও উত্তরণের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধিতর করেছে। কবিব্যক্তির প্রেমার্ত আবেদনকে অতিক্রম করে বনলতা হয়ে ওঠে চিরকালীন শ্রেয় ও প্রেয় বিশেষত্বের প্রতীক। এ অনুভব পাঠকের। জীবনানন্দ যাকে বলেছেন, 'ইঙ্গিতের দিব্যতা'। শোনা গেল একটি আশ্বাস সম্ভাষণ–

''এতদিন কোথায় ছিলেন ?''

তাঁরই লেখা 'কারুবাসন' উপন্যাস থেকে বাল্য প্রেমের স্মৃতিসূত্র মেলে। বনলতা সেন সূত্র এডগার অ্যালান পো'-র হেলেনের কতা সমালোচকেরা বলেছেন। কিন্তু অভয়া বনলতা, শ্রাবন্তী পুরীর বৌদ্ধশিল্পীর কারুকার্যমুখ, আশ্রয় নীড়ের মতো চোখ– হেলের সাথে সমাকৃত হতে পারে না। বনলতার নির্মাণ নেপথ্যে মিশরী বীজের ছায়া পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাকে ব্যপ্তি দিয়েছে কবি ইতিহাস পুরাণের তথ্যে সাহায্য করেছে পরাবাস্তব চিত্রকল্পে। মননশীলতা ও ব্যঞ্জনাধর্মী স্পর্শে জীবনানন্দের কবিতা অনবদ্য হয়ে উঠেছে। একদিকে 'বনলতা সেন' যিনি প্রিয় ও পার্থিত কিন্তু দেশ কালের গণ্ডীবদ্ধ, যিনি বিশিষ্টভাবে নাটোরের। অন্যদিকে, যুগ-যুগান্ত ব্যপ্ত মানব অন্বেষার ঐতিহাসিক

AMBITION
Edition 2017

কালপ্রেক্ষিত, হাজার বছর পথ হাঁটা ইতিহাসের ধূসর জগৎ, নিশীথ সমুদ্র এবং দিক্‌ভ্রান্ত নাবিক। 'নাবিক' শব্দটি তাঁর একাধিক কবিতায় আছে যা অন্বেষণ প্রয়াসী মানুষের প্রতীক। এইভাবে অতীত ও অধুশ এই দ্বিমাত্রিক আয়তনের সঙ্গী চিহ্নহীন সমন্বয়ে কবিতাটি ঐতিহ্য আশ্রয়ী। এলিয়ট চেতনা হল চিরপ্রবাহিত কালের মধ্যে অস্তিত্ব ও আবেগের সমানুপাতিক সাজ-সজ্জা। 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় মৃত সভ্যতার ধ্বংস স্তূপের উপর বনলতা সেনকে পুণরায় আবিস্কার করেন কবি। সম্ভবত প্রিয় বস্তুকে সময়ের উর্দ্ধে জয়ি করবার জন্য। অতএব এই কবিতায় দেখলাম এক অনন্ত প্রবহমান কালস্রোতে ভাসমান থেকে মানব যাত্রিকের উত্তরণের প্রসঙ্গ ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়েছে।

AMBITION

জীবনানন্দ অনুভবের সত্যকে সারা জীবন ধরে অন্বেষণ করেছে ইতিহাস চেতনার মধ্যে, সমাজ চেতনার মধ্যে, ইন্দ্রিয়ঘনতার মধ্যে, এমন কী মগ্ন চৈতন্যের গভীরেও। শিল্পী তাঁর মনোজগৎকে খুঁজে বলেছেন, এর অর্থাৎ অবচেতন মনের ছবি অস্পষ্ট ভাবে জেগে থাকে বাসমান তুষার শিলার মতো। বনলতা সেন কবিতায় পরাবাস্তবের ছবি ও ক্রিয়াশিলতা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অনুরমণীয়। Fantasy সৃষ্টি হয়েছে শ্রাবন্তীর কারুকার্যের, বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগতের চিত্ররূপ রচনায়। লক্ষণীয়, জীবনানন্দ বলেছেন - পৃথিবীর সব আলো একদিক নিভে গেলে পরে মানুষ আর থাকবে না।

''রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন
সেই মুখ আর আমি বর এই স্বপ্নের ভিতরে।''

(স্বপ্নব - মহাপৃথিবী)

বনলতা সেন কবিতাটিতে অন্ধকারের পরিচিতে 'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

স্বপ্নময় এবং অন্ধকারময় পরিবেশ যে বাক্ প্রতিমা নির্মাণ করেছে সেখানে ফুটে উঠেছে চিরন্তনী নারীর অবয়ব। ক্রমশ যে সচেতন হচ্ছে এবং পরম আশ্বাস করে কবির সাথে মুখোমুখি বসেছে নিবিড় সৌন্দর্য অনুধ্যানে। আবহমান ইতিহাসচেতনা ও সমচেতনা ধারায় এমন পরাবস্তব সৌন্দর্য মূর্তির আস্তিক্যবোধকে উপলব্ধি অভিনব। এই অধিবাস্তব চেতনাই এক স্বপ্নময় অথচ অনুভব যোগ্য বাস্তবতা বিরাজ করেছে কবি ও পাঠকের মন জুড়ে। এই বনলতা বহুকাল ধরে এ সময় ও দূর ভবিষ্যতেও ও ব্যপ্ত থাকবে। বিশ্বাস যোগ্যতার উর্দ্ধে চিরন্তনী নারীর আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করবে কে ? দূরপ্রসারী চেতনালোকে তাই বনলতা মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী রূপে কবিমনে হারানো সৌন্দর্যের হারানো পূর্ণতার অভিপ্রায় উদঘোষিত করল।

৩। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন (অনধিক ১০০ শব্দে) ঃ **৬ x ৪ =২৪**

খ) অক্ষর ও দল কাকে বলে উদাহরণসহ লিখুন।

উত্তর ঃ- অক্ষর - বাক্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা একঝাঁকে শব্দের যে স্বল্পতম অংশ উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বা দল বলে। শব্দের এই হ্রস্বতম অংশগুলি হল অব্যঞ্জন বা সব্যঞ্জন একটি স্বরধ্বনি।

অক্ষরের এই শ্রুতিগ্রাহ্য রূপটিই হল মাত্রা। ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় অক্ষরকে 'বাক্যের অণু' বলেছেন। ইংরেজীতে Syllable-এর পরিবর্তে 'অক্ষর' শব্দটির ব্যবহার ছন্দ বিজ্ঞানের প্রচলিত। আবার বাংলায় অক্ষর বলেত অনেকেই ইংরেজী Letter বলে থাকেন। কিন্তু Letter বলতে বর্ণ বা হরফকে বোঝায় অক্ষরকে নয়।

■ ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপই হল বর্ণ বা হরফ। যেমন - ক, খ, আ ইত্যাদি। আর এক বা একাধিক বর্ণ মিলিত হয়ে যখন ধ্বনির এককে প্রকাশ করে তখন তাকে অক্ষর বলে। যেমন - পাখি প =প্ + আ

খি = খ্ + ই

Edition 2017

পাখি এই শব্দটিতে বর্ণ আছে প্ + আ + খ + ই কিন্তু অক্ষর আছে পা, খি। এই অক্ষর দু' রকমের - (১) মুক্ত অক্ষর, (২) রুদ্ধ অক্ষর।

মুক্ত অক্ষরঃ-

যে অক্ষর উচ্চারণে আমাদেরর বাগযন্ত্র কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় না, তাকে মুক্ত অক্ষর বলে ? ক / ম / ল - ন / বী / না শব্দগুলিতে মুক্তভাবে উচ্চারিত তিনটি ধ্বনিস্তর আছে। এই তিনটি ধ্বনি স্তর তিনটি অন্যর বলে

চিহ্নিত এবং প্রত্যেকেই এখানে মুক্ত অক্ষর।

রুদ্ধ অক্ষর - যে অক্ষর উচ্চারণে আমাদের বাগযন্ত্র কোথাও না কোথা, কোনো না কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে রুদ্ধ অক্ষর বলে। বন্, ঝন্, ঝিন্, রিন্। যখন আমরা 'বসন্ত' শব্দটি উচ্চারণ করি তখনও তিনটি ধ্বনি স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রত্যেক ধ্বনি স্তরে একটি করে অক্ষর। সুতরাং, 'বসন্ত' একটি অক্ষর। অথচ লক্ষ করা যাবে যে, (ব) অক্ষরটির উচ্চারণে বাকযন্ত্র বাধাপ্রাপ্ত হয় না. তাই একটি মুক্ত অক্ষর। কিন্তু (সন্) অংশটি উচ্চারণে বাগযন্ত্র বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই তাকে বদ্ধ / রুদ্ধ অক্ষর বলে। এই মুক্ত বা রুদ্ধ অক্ষরকে চিনবার জন্য দু' দরনের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করসা হয়। মুক্ত অক্ষরের জন্য ( ) অর্ধচন্দ্র এবং রুদ্ধ অক্ষরের জন্য (–) ড্যাশ ব্যবহার করা হয়।

AMBITION

ছেদ ও যতি ঃ- কোন বাক্য পড়ার সময় তার সমগ্র বা আংশিক অংশ পরিস্ফুটনের জন্য ধ্বনি প্রবাহে যতে উচ্চারণ বিরতি আবশ্যিক হয় তাকে ছেদ বলে।

কোন বাক্য পড়ার সময় শ্বাস গ্রহণের জন্য যে বিরতির প্রয়োজন হয় তাকেই যতি বলে। অর্থাৎ বিতরিত অন্য নাম হল যতি বা বিরাম। কবিতা পাঠ রার সমজয় একটি কবিতা পংক্তি আমরা একটানা উচ্চারণ করি না। কয়েকবার সচেতন বা অচেতন ভাবে বিরতি পালন করি। কবিতা পাঠা কালের এই বিরতিকে যতি বলে।

সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রে পিঙ্গলা চার্য 'যতি' কথাটির ব্যবহার রেছেন। ছন্দ মঞ্জরীতে গঙ্গাদাস এ সম্বন্ধে লিখেছেন–

''যতি র্জিহ্বেষ্ঠ বিশ্রাম্ স্থানং কবি ভিরুচ্যতে।
–সাবিচ্ছেদ বিরাম দ্যৈঃ পদৈ র্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া।।

যেখানে জিহ্বা স্বেচ্ছায় বিশ্রাম লাভ করে কবিগণ তাকেই যতি বলেন। এরই নামান্তর বিচ্ছেদ বা বিরাম। উচ্চারণারী স্বেচ্ছায় পদের উচ্চারণে এই বিরাম বা বিচ্ছেদ আনেন। (অনুবাদ নীলরতন সেন)

গুরুত্বের তারতম্য ভেদে বাংলা ছন্দে পাঁচ প্রকার যতি দেখা যায়। এগুলি হল

ক) পূর্ণযতি (Full Pause)
খ) অর্ধযতি (Middle Pause)
গ) লঘুযতি (Primary Pause)
ঘ) উপযতি (Secondary Pause)
ঙ) অনুযতি (Syllabic Pause)

দলঃ- বাগমন্ত্রের একবারের চেষ্টায় শব্দের অন্তর্গত যেটুধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারিত হয়, তাকে বলে দল। যেমন - অ, আ, ক, কি, সি, দিক প্রভৃতি।

দলের প্রকারভেদ ঃ- দল দু প্রকার- একটিকে বলা হয় - ১। মুক্ত দল। ২। রুদ্ধ দল। যেমন - অ, আই, ই, কি (মুক্ত দল)

দিক, নিক, ঢেউ, সেই, চান, টান, আই প্রভৃতি।

ঘ) 'নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি'- প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ- " নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি "—

—উদ্ধৃত লাইনটি মেঘনাদবধ কাব্য ষষ্ঠ সর্গ থেকে নেওয়া হয়েছে।

Edition 2017

সীতা উদ্ধারের জন্য মেঘনাথ ও রাবণ বধ প্রয়োজন কিন্তু মেঘনাদ যে রকম পরাক্রমশালী, ভাই লক্ষণকে পাঠালেন, তাঁর জীবনশঙ্কা আছে, তাই লক্ষণের প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁকে বিনাশের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেয়ে সীতা উদ্ধারের চেষ্টা না করার কথা বলেছেন। দেবানুগ্রহ ও দৈবাস্ত্র পাওয়া সত্ত্বেও, ভাইয়ের প্রতি মমত্ব ও মেঘনাদের দুর্বার শক্তির পরিচয় তুলে ধরবার জন্য এ অংশ পরিকল্পিত হয়েছ মনে করা যায়।

বিভীষণকে সম্বোধন করে রাম চন্দ্র সীতা উদ্ধারের আর প্রয়োজন নেই বলেছেন। প্রধানতঃ মহাবিক্রমশালী ইন্দ্রজিতের কাছে লক্ষণের পরাভাবের সম্ভাবনার কথা ভেবে।

ছ) 'শতাব্দীর সূর্য আজি' কবিতার সারবস্তু কী ?

উত্তর ঃ- অস্ত্রে অস্ত্রে যখন রক্তাক্ত সংগ্রাম চলছে, তার মধ্য দিয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্ত গেল। কুটিল ফনা তুলে নির্মম সভ্যতা নাগিনী তার বিষদাঁত নিয়ে উত্যত। লোভী স্বার্থান্বেষীদের মুখোশ খসে গিয়ে বেধেছে সংঘাত। তারা জাতিপ্রেমের নামে, ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে বর্বরতায় মেতে উঠেছে। শ্মশান কুকুরের মতো একদল কবি এর প্ররোচনা দিয়ে জয়গান গাইছে।

জ) পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন – ব্যাখ্যা লিখুন।

" পাখির নীড়ীরে মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন "

এই কথাটির মধ্যে বোঝা যায় কবির মন কীভাবে কাজ করেছে। নাটোরের বনলতা সেনের যে চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ এ সমস্তই যে কোনো সর্বদেশ কালব্যাপী ভাবের উপমা মাত্র তা উপলব্ধি করে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

রবীন্দ্র ঐতিহ্য মুক্ত হ য়েও, তিনি একান্তরূপেই রোমান্টিক ভাবকে তিনি কয়েকটি খন্ড খন্ড ছবি কে চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন।

কবির কাব্যের প্রান হল অদ্ভুত মিশ্রণে, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের। পুরানোর সঙ্গে নতুনের, অসম্ভবের সঙ্গে সম্ভবের এসে দেখেন নাটোরের বনলতা সেনকে সে পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলে " এতদিন কোথায় ছিলেন এটাই জীবনানন্দের দক্ষতা। সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন জীবনানন্দ ইয়েটস এর মতো অতীত জগতে আর স্বপ্নের বস্তুতে সৌন্দর্য খুঁজে পান। বনলতা সেন -এ এমন একটি জগতের জন্য আকাঙ্খা তাঁর ব্যক্ত হয়েছে যেখানে হৃদয়ের ইচ্ছা আর অনুভূতির ও কল্পনার উল্লাস তৃপ্তি পেতে পারে। কবির প্রেম কাতর হৃদয় অতীতের সমস্ত মোহ যেন এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর অন্তহীন প্রেমানুভূতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে "বনলতা সেন "–এ।

" চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবন্তীর কারুকার্য.....।"

নাটোরের একটি সাধারণ নারীকে কবির প্রেমানুভূতি, কারুকার্যখচিত করে তুলেছে। যে রূপ জীবনানন্দ সৃষ্টি করেন আবেগের তাড়নায় তা শুধু দৃশ্যের বিষয়ীভূত নয় তা উপলব্ধিরেও– এখানেই জীবনানন্দ দাশ এর স্বচেতন স্বকীয়তা।

AMBITION
Edition 2017

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৬ ও জুন, ২০১৭

বাংলা (Bengali)

সহায়ক পাঠ্যক্রম (Subsidiary)

তৃতীয় পত্র (S-3) SBG-III : Upanyas-Chhoto Golpo-Probondho-Natak)

AMBITION

বিভাগ - ক

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ (অনধিক ৪০০শব্দে) ২০ x ২ =২০

খ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'গীতিকাব্য' অবলম্বনে গীতিকবিতা ও নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- পাশ্চাত্য সাহিত্যে যা 'লিরিক' নামে পরিচিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই গীতিকাব্য বলেছেন। লিরিক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ছিল এই যে - লায়ার সংযোগে পেয় কবিতার নামই গীতিকবিতা। বঙ্কিচমচন্দ্র লিরিকের গেয় মূল্যের কথা স্বীকার করে গীতিকাব্যের গেয় মূল্যের কথা স্বীকার করেছেন।

'গীত' থেকে গীতিকবিতার জন্ম এবং মনের রেশ-আবেগ ও ভাব প্রকাশের আগ্রহ থেকে গীতিকবিতার জন্ম। গীতির উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন– 'গীত মানুষের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা কন্ঠ ভঙ্গীতে স্পষ্টীকৃত হয়। ...স্বরবৈচিত্রের পরিণামই সংগীত। সুতরাং, মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রগাতিশয্য প্রযুক্ত মনুষ্য সংগীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবত যত্নশীল। কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্যভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না; অতএব সংগীতের সাথে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।''

গীতের পারিপাট্যের দুটি জিনিসের প্রয়োজন স্বর ও শব্দচাতুর্য। সাধারণত এ দুটি গুণের সমাবেশ একজনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। ফলে একজন গীতরচনাকারী; অপরজন গায়ক। এইখানেই গীত ও গীতিকাব্যের পার্থক্য। 'গীত হওয়ায় গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও ছন্দবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়কএবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যক্তক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূর রহিল, অনেক গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল''। বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের সংজ্ঞা প্রদানকালে বলেছেন- 'গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য। প্রকৃতপক্ষে সংগীত ও গীতিকবিতা উভয়ের উদ্দেশ্য এক। হৃদয়ের ভাবোচ্ছাসকে পরিস্ফুট করা সর্বতোভাবে সম্ভব হয় না। মনে যে ভাব জাগে কথায় বা কাজে তার সামান্য অংশ প্রকাশিত হয়, অনেকখানি অনুচ্চারিত ও অব্যক্ত থেকে যায়। প্রকাশিত হলেও গীতিকাব্যের সৃষ্টি হয়। গীতিকাব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নাটক ও গীতিকাব্যের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। সাথে সাথে মহাকাব্যের পার্থক্যও নির্ণীত হয়েছে। মানবহৃদয়ে উত্থিত বিভিন্ন ভাবের কিছু অব্যক্ত থাকে। ক্রিয়া এবং সংলাপের দ্বারা ব্যক্ত ভাবেই রূপদানই হল নাটক। আর যা অব্যক্ত থাকে তা হল গীতিকাব্যের সামগ্রী। নাটক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য হৃদয়ের ভাবপ্রকাশ করলেও, নাটক ও গীতি কবিতার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়ার দ্বারা যে ব্যক্ত হয় তাই নাটকের সামগ্রী। পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া বা কথোপকথনের দ্বারা যা ব্যক্ত হয় না, যা অব্যক্ত থাকে তাই গীতিকাব্যের বিষয়। নাট্যকারের ক্ষেত্রে তন্ময়তা, গীতিকাব্যের ক্ষেত্রের মন্নয়তা।

Edition 2017

বঙ্কিমচন্দ্রের গীতিকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে গীতিকাব্যের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গীতিকবিদের নামোল্লেখ তাঁর বক্তব্যকে যুক্তিসিদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জনী তাঁর মতে গীতিকাব্যরূপে উৎকৃষ্ট। গীতিকাব্যের মূলমন্ত্র যে আত্মলীন ভাবুকতা –বঙ্কিমচন্দ্র তা স্বীকার ও উল্লেখ করলেও আধুনিক লিরিকের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন নি এবং প্রাচীন ও আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্য আবিস্কারে এবং গীতিকাব্যের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে তাঁর বক্তব্য প্রবন্ধটিকে সার্থক করেছে।

ঘ) 'পুঁইমাচা' গল্পের নামকরণ কতখানি যুক্তিযুক্ত ?

উত্তর ঃ- বিভূতিভূষণের "পুইঁমাচা" গল্পটি অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠগল্প। "মেঘমল্লার" গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত এই গল্পের

নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পের নামকরণের মধ্যেই নিহিত থাকে রচনাটির প্রাণের অন্তরঙ্গ সারটুকু। তাই গল্পটি পড়বার আগে শুধুমাত্র তার শিরোনামটুকুর মধ্যেই পাঠকগল্পের স্বতন্ত্র মেজাজটি খুঁজে পান। রচনার সমস্ত বক্তব্যটি নামকরণের নিটোল সংহত ক্ষুদ্র অবয়বখানির মধ্যদিয়ে পাঠকমনের দর্পনে নিমেষে স্পষ্টভাবে প্রতিনিধিত্ব হয়। সমগ্র গল্পটির প্রেক্ষিতে শান্ত, সরল, ঘন পরিবেশে থাকার কারণে এবং তা গল্পের রসকেন্দ্রে অন্য বঞ্চনা দেওয়ার জন্যই লেখকের প্রকৃতি ভাবনার পুঁইমাচা নামের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এমন নাম যেন লেখক ব্যক্তিত্বের বিভা। অন্য কোন নামে এ গল্পকে চিহ্নিত করা যেত না।

গল্পের একেবারে প্রথম দিকেই লেখকের কাহিনী বর্ণনার সূত্রে ক্ষেন্তীর হাতেই দেখা যায় পুঁইগাছ, সে পুঁইগাছ গল্পের শেষে ক্ষেন্তীর জীবনমজুর পাশাপাশি হয়েছে এক প্রতীকী অস্তিত্ব। গল্পরসের বর্ণময় —

"তাহার হাতে একগোছা পুঁই শাক, ডাটাগুলি
মোটা ও হলদে, হলদে চেহার দেখিয়া মনে
হয় কাহার পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া
উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল।।
মেয়েটি তাহার উঠানের জঙ্গল প্রাণপনে।
তুলিয়া আনিয়াছে।।"

এই বর্ণনার পাশেই দেখি ক্ষেন্তীর পার্শ্ববর্তীনী ছোট বোনের হাতে পুঁইপাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য। ক্ষেন্তী তার বাবার কাছে "পাতা জড়ানো দ্রব্যটি মেলিয়া ধরিয়া বলিল চিংড়ি মাছ বাবা।"

এই সমস্ত খন্ডচিত্র ও সংলাপে আমরা সেই সময়ের দরিদ্র গ্রাম বাংলার দরিদ্র নলিন রূপটি যেমন দেখতে পাই, পাশাপাশি গল্পটির নামে উপযোগী বিষয়বিন্যাসও বুঝতে পারি। গ্রাম্য বাঙালির পরম পুইঁশাক যেমন একান্ত উপাদেয় ও সহজলভ্য খাদ্য তেমনি তার মধে চিংড়িযোগের স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবে স্বাদু রকম প্রয়াস সহজেই ভোজন বাসনা তীব্রকারে, ক্ষেন্তীর এই তৎপরতা মায়ের কাছ থেকে তার জন্য অসম্ভব ভৎর্সনা প্রাপ্তি ও চাপ অভিমানে অশ্রুসজল হওয়ায় সেই পুঁই শাকের পাতা কুড়িয়ে বাড়িতে এনে চুপি চুপি পুঁইগাছে পুঁইগাছের তরকারী বানানো, খাওয়ার সময় পরম লোভের টানে তা নিঃশেষ করে খাওয়া এমন সব স্বর্শকাতর অভিমান রঞ্জিত খুবই ছোট ছোট মান অভিমানের পারিবারিক চিত্র পুঁইমাচা গল্পের প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। গ্রামের মানুষের অসহায় ও দারিদ্র্যের মধ্যে এই জীবনধারণ পদ্ধতি যেমন অসামান্য বাস্তবতায় আঁকা তেমনি গল্পের অঙ্গে এদের অবস্থান মূল্যবান প্রত্যঙ্গের গুরুত্ব আনে। গল্পের পরবর্তী অংশে আছে অকালে ক্ষেন্তির শীর্ণকায় পুঁইগাছের চারা লাগিয়ে তাকে বড়ো করে তোলা, বাঁচিয়ে রাখার আন্তরিক তৎপরতা। ক্ষেন্তীর লোভের সঙ্গে, খাদ্য প্রীতির সঙ্গে, রসনার সঙ্গে এসব খেয়াল ও খেলাগল্পের শেষে অজ্ঞাতে তার নিয়তির লীলার প্রতিরূপে আরেক সত্যকে প্রকাশ করে তোলে। সুতরাং "পুঁইমাচা" নামটি কাহিনী বিষয়ের ব্যাখ্যায় যে সার্থক বোধ করি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গল্পটির নাম "পুইঁশাক", "পুঁইলতা," "পুঁইচারা", "পুঁইগাছ", "পুঁইডাটা" ও লেখক রাখতে পারতেন। বিষয়ের সঙ্গে তার এতটুকু হত না কিন্তু লেখক তা না করে নাম রেখেছেন "পুঁইমাচা"। গল্পের নামকরণের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সবুজ, সতেজ উদ্ভিদটি নয় তার বেড়ে ওঠার প্রধান অবলম্বনটিও শিরোনামের বিষয়ের মধ্যে এসেছে। লতা নিজের থেকে কখনো সোজা হয়ে বেয়ে উঠতে পারে না —তার একটি শক্ত মাচার প্রয়োজন হয়। এখানে পুঁই চারাটি সযত্নে রোপিত বলেই তার জন্য বিশেষভাবে একটি মাচার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাটিতে বেড়ে ওঠায় তার গৌরবহীনতায় বর্ণনায় বেড়ে ওঠায় তার গৌরব প্রতিটি গল্পের মাচাতেই পুঁইগাছটি অফুরন্ত প্রাণ স্বভাবে ভরপুর। লেখকের কথা "মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে – নরধর, প্রবাহমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।" অথচ তাকে সে অতবড় হওয়ার সুযোগ করে দেয় সেই ক্ষেন্তীই পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছে ক্ষেন্তী ও পুঁইগাছের স্বভাবের সে বৈপরীত্য, তা অসাধারণ শিল্পের ব্যঞ্চনা পেয়েছে পুঁইগাছের এমন স্বভাবের জন্যই। পুঁইমাচায় পুঁইগাছের এই হাত বাড়ন্তের চিত্র গল্পের নামের গভীরতর বঞ্চনা বয়ে আনে, পুঁইমাচা নামকরণটির মধ্যে আর একটি ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ চিহ্নিত করতে পারি। তা হল বিভূতি ভূষণ প্রকৃতি প্রেমিক, পুঁইমাচা গল্পে এই প্রকৃতি মানসিকতায় পরিচয়টি স্পষ্ট। প্রকৃতিকে এই গল্পে পুঁইগাছের প্রতীকে ঘন পিনবদ্ধ করেছে। মানুষের জীব ও প্রকৃতির সমস্ত উপকরণ ও স্বভাব দিয়েই গড়া, মৃত্যু তার প্রকৃতিতেই বিলীন হওয়া। যে অস্তিত্ব প্রকৃতিরই সীমা আছে, প্রকৃতি কিন্তু অসীম। মানুষ

AMBITION
Edition 2017

মায়া মমতা-প্রেম, সুখ-দুঃখ-লোভ-স্বার্থ- এসমস্ত কিছু দিয়েই প্রকৃতি প্রদত্ত জীবনকে নিজের মতো করে রাখে ।প্রকৃতি তাকে ভাঙে, তার সবকিছু গ্রাস করে মৃত্যু দিয়ে । প্রকৃতির আপন প্রাণবেগে, শক্তি, স্বতস্ফূর্ত ঠিকানা মানুষকে তুচ্ছ করে দেয় । ক্ষেন্তীর সামগ্রিক জীবন ও মৃত্যু এইপ্রকৃতির খেলা । এই খেলা নির্মম,নিরাশক্তি তা যদি না হতো ক্ষেন্তীর চলে যাওয়ার পরেও কোন রহস্যে তারই শিশুকাল লালন করা, বড়ো আদরের পুঁইগাছটি জীবনের আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য পায় ।

নামকরণ যে শুধুমাত্র বিষয় ও কাব্যের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয় । চরিত্র ও ঘটনাতেও বিসৃত হতে পারে । অবশ্য তা ঘটে লেখকের নির্বাচন ক্ষমতা এবং গল্পের মেজাজের উপর নির্ভর করে । তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে গল্পটির নাম ক্ষেন্তী হল না কেন ? এর উত্তরে বলা যায় ক্ষেন্তীর নামকরণ করা হলে তার করুন পরিনীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হলেও তাতে প্রত্যেক দিকটাই ফুটে উঠত, গল্পের শেষে লেখক সেই চমকটাই দেখা যত না ক্ষেন্তী নামকরণে ।

AMBITION

তাই সবশেষে বলা যায় প্রকৃতির রহস্যসন্ধানী বিভূতিভূষণ মাচায় বেড়ে ওঠা পুঁইগাছকে প্রতীক করে নিজের বিশেষ দৃষ্টিকে গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষে Pointing fingure করেছেন । সুতরাং পুঁইমাচা" গল্পটির নামকরণ সার্থক সুন্দর ।

২ । যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন (অনধিক ৩০০ শব্দে)ঃ **১২ x ৩ =৩৬**

ক) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে মতিবিবি চরিত্রটির গুরুত্ব আলোচনা করুন ।

উত্তর ঃ কপালকুন্ডলা ও নবকুমার সমতল চরিত্র কিন্তু লুৎফা-উন্নিসা বা পদ্মাবতী বা মতিবিবি তার বৈচিত্র ও জটিলতা নিয়ে পূর্ণবৃত্ত আলোচনা করেছে । বঙ্কিমের চরিত্র সৃষ্টির সে এক অত্যুজ্বল নিদর্শন । মতিবিবি জটিল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, কূটবিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন, আত্মসুখান্বেষী, ইন্দ্রীয়সম্ভোগরত ও ধর্মবিজ্ঞান বিবির্জিত । সে স্বাধীনতা কামনা করেছে । তবে স্বাধীনতা তার কাছে ব্যাভিচারের নামান্তর মাত্র ।

উপন্যাসে বর্ণিত উপকাহিনির সে নায়িকা । কিন্তু যখন সে এসে মূল প্রবাহে যোগ দিল তখন সেখানে সৃষ্ট হল গভীর আলোড়ন ।সেই আলোড়নে নবকুমার ও কপালকুন্ডলা তলিয়ে গেল ওতার নিজের পরিণাম অধ্যায় করুণ রেখায় অঙ্কিত হল । কপালকুন্ডলার পাশে এই আত্মসচেতন, দীপ্তিময়ী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্র স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে বৈপরিত্যের সমাবেশ করেছেন ।

ভোগরত মতিবিবির জীবন প্রতিপুষ্পবিহারনী মধুকরীর মতো । এই প্রণয় হীনের পাষান প্রাণে কেমন করে প্রণয় সঞ্চার হল এবং যে প্রণয় প্রথমে তার নিজের অগোচর ছিল, সেটাই কেমন করে বাইরে থেকে গতিবেগ লাভ করে তার চিরাভ্যস্ত জীবনকে বিপর্যস্ত করল, মতিবিবির চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে এটাই প্রধানত লক্ষণীয় বিষয় ।

মতিবিবি রূপগর্বিতা । প্রধানত: এই কারণেই নবকুমারের কাছে সপত্নীর রূপের খ্যাতি শুনে সে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে । সপত্নীভাষনের আগে তার বেশভূষার পরিপাট্য সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলে । নবকুমারের প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য সে বলেছে –''স্ত্রী লোকের গহনা থাকিলে সে না দেখাইয়া বাঁচে না'' । পরিহাস ছলে বললেও এটাই হয়তো ঠিক কথা । কপালকুন্ডলা তাকে নাই বা চিনিল । রূপ ও ঐশ্বর্যের অধিকারিনী মতিবিবি হয়তো সপত্নীকে আপনার রূপ ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছে ।

মতিবিবি অস্পষ্ট আলোকে প্রথমে কপালকুন্ডলাকে ভালোভাবে দেখতে পায়নি । সেইজন্য তার – ''অধম পার্শ্বে ও নয়ন প্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল ।'' এই হাসি নগন্য প্রতিদ্বন্দীকে দেখে বিজয়গর্বিতের তাচ্ছিল্যের হাসি । কিন্তু যখন সে ভালো করে দেখার জন্য প্রদীপটি তুলে ধরে কপালকুন্ডলার মুখের কাছে এনেছে, – ''তখন সে হাসি হাসি ভাব দূর হইল, মতির মুখ গম্ভীর হইল ।'' আপনার রূপের প্রভায় প্রসিদ্ধ আমীরদের যে ক্রিতদাস করে রেখেছে, যুবরাজ সেলিম যার রূপের পূজারী, সামান্য নারীর কাছে আজ তাকে পরাজয় স্বীকার হল । এইজন্য সহসা গাম্ভীর্যভাব তার ।

Edition 2017

স্বামী ও সপত্নীর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতে মতিবিবির মনের উপর যা প্রতিক্রিয়া হয়েছে । বর্ধমানের পথে পেরমন সঙ্গে সাক্ষাতে সংলাপের ভেতর দিয়ে আমরা তার প্রথম আভাষ পাই । মতিবিবি যখন সেলিমের পরিবর্তে খসরুকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তখনই সে সংকল্প করেছিল যে, এই উপায়ে প্রতিদ্বন্দী মেহের উন্নিসার । সিংহাসন প্রাপ্তির পথ রোধ করতে পারলে সে এরপর কোনো আমীরকে বিবাহ করে অবশিষ্ট জীবন আমীর গৃহিনী

রূপে কাটিয়ে দেবে। এখন মনে হল যে যদি আমীর গৃহিনী হতে হয়, তবে নবকুমারকে সেই আমীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এভাবে সে নবউন্মোচিত প্রণয়ের সঙ্গে তার স্বাভাবিক ভোগলিপ্সার মোটামুটি একধরনের বোঝাপড়া করতে চেয়েছে।

কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে, আমীর গৃহিনী হবার পরিকল্পনা করলেও এটাই প্রকৃতপক্ষে তার আকাঙ্খানীয় নয়। তার গোপন বাসনা অনেক উর্দ্ধে সে ভুলতে পারেনি যে যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে মেহের উন্নিসার সাক্ষাতের আগে সে ভারতসম্রাজ্ঞী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। নবকুমারের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত মতিবিবির জীবন একটানা স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। এখন সে দুই পথের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্তরে প্রণয়ের সঞ্চার না হলে কখনও সে রাজধানীর মোহ ছেড়ে সপ্তগ্রামে ছুটে আসত না। এটি যেমন সত্য তেমনি সত্য মেহের উন্নিসা তার উচ্চাকাঙ্খার অন্তরায় না হলে এই প্রণয় অঙ্কুরেই নষ্ট হতো।

পান্থ নিবাসে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে একটি দীর্ঘ নি:শ্বাসের শব্দে যার সূচন নবকুমারকে আমীর করবার সঙ্কল্পে যার প্রথম স্পষ্ট অভিব্যক্তি, আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পর পেষমন এর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের ভিতর দিয়ে আমরা মতিবিবির জীবনের সেই গতিকেন্দ্র পরিবর্তনের পূর্ণ ইতিহাস পাই। মতিবিবি সুখ খুঁজেছে। ঐশ্বর্য ধনসম্পদ গৌরব প্রতিষ্ঠা কোন কিছুরই তার অপ্রাচুর্য নেই। কিন্তু সে বুঝেছে একদিনের জন্যও সে সুখী হতে পারেনি। বুঝেছে ভোগে কেবল তৃষ্ণা বাড়ে মাত্র। এই অনুভূতির সঙ্গে তার মনে হয়েছে, আগ্রায় যুবরাজ সেলিমের বিলাসের ভিতর যে ঐশ্বর্য খুঁজে পায়নি পান্থনিবাসে যে নিরাবরন তরুনিকে সে দেখেছিল , সে তরুনীই হয়তো সেই ঐশ্বর্যের অধিকারী ।

বস্তুত: নবকুমারকে দেখে তার মনে প্রণয় সঞ্চার হলেও অন্যদিক দিয়ে তার চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। তার ভোগ তৃষ্ণা তেমনই প্রবল, আকাঙ্খা তেমনই দূর্দমনীয় এবং কার্যসিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে সে তেমনই উচিত ও অনুচিতের বিচার শূণ্য। ফলে সে যে নতুন কাজ করল তাতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ তো হলই না বরং দুটি অমূল্য জীবন ধংসের পরোক্ষ কারন হল সে।

তাহলেও মতিবিবির চরিত্রে যা কিছু মহৎ ও তা নবকুমার ও কপালকুন্ডলার স্পর্শে বিকাশ লাভ করেছে। নবকুমার থেকেই তার নিরীত্বের জাগরন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে তার চরিত্রানুযায়ী নবকুমার ও কপালকুন্ডলার চিরবিচ্ছেদ ঘটাবার সঙ্কল্প করলেও কাপালিকের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেনি। তার ভিতরকার শাশ্বত নারীত্ব হত্যার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। শেষপর্যন্ত সুখবিলাসী মতিবিবি সাংসারিক সুখের মর্মব্যঞ্জনা, তার মাধুর্যমর্যাদা উপলব্ধি করেও অদৃষ্টের পরিহাসে তা থেকে চিরঞ্জিত রইল। অথচ ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, রমনীযতা ও হৃদয়বত্তায় এই মোহিনী কারো চেয়ে কম ছিলোনা। কিন্তু তার শৃঙ্খলাহীন অনিয়ন্ত্রিত জীবন তাকে বায়ুতাড়িত পত্রের মতো জীবনের মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করে ধবংসস্রোতে ভিষিয়ে নিয়ে গেল। নবকুমারকে আশ্রয় করে তার ঘর বাঁধবার স্বপ্নপূরণের স্বাদ চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। তবুও আমরা বলতে পারি 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে মতিবিবিই সর্বাপেক্ষা উজ্বল ও জীবন্ত চরিত্র।

গ) 'বই কেনা' প্রবন্ধ অবলম্বনে সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যশৈলীর পরিচয় দিন।

উত্তর ঃ- ঘরমুখো বাঙালি বইমুখো করার জন্য প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী নানা ধরণের মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বাঙালির বই প্রীতির একটি গল্প বলেছেন। ড্রইংরুম বিহারিনী গেছেন বাজারে। উদ্দেশ্য, স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে উপহার কেনা। কিছুই পছন্দ করতে পারছেন না তিনি। দোকানদার নানা জিনিস দেখায়। না, গরবিনী নারীর কোন কিছুই পছন্দ হয় নি। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বলল– 'একখানা ভালো বই দিলে হয় না ?'নাসিকা কুঞ্চিত করে তৎক্ষনাৎ উত্তর 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।' জ্ঞানচক্ষু বৃদ্ধির নিমিত্ত বই কেনা তো দূরের কথা, একখান বই-ই তার কাছে যথেষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন অনেক গল্পই বলা যায়। কিন্তু প্রবন্ধকারের আপশোষ এতেও কি বাঙালির চেতনা হবে ? বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা নেই একথা বল;া চলে না। যা নেই তা হল জ্ঞান আহরণের জন্য বই কেনার প্রবৃত্তি। এখানে বাঙালি বড়ই কৃপণ। বাঙালির কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই কৃপণতা নেই। ফুটবল মাঠে কিংবা সিনেমার টিকিটে বাঙালি অনেক পযসা খরচ করে।

বৃষ্টির দিনে খোশ গল্প লেখার অভিপ্রায় কলম ধরেছিলেন সৈযদ মুজতবা আলী। লেখাটা শেষ করতে চেয়েছেন তিনি। গল্পটা সকলেরই জানা। আরব্যোপন্যাসের গল্প। গল্পটার গূঢ়ার্থ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন সবেমাত্র। গল্পটির বিষয়বস্তু এ প্রসঙ্গে পরিবেশন করছি : এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই হস্তগত করতে না

AMBITION
Edition 2017

পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল রাজার। বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে রাজা বইখানা পড়ছেন। পাতায় পাতায় বইখানি এমনই জুড়ে গেছে যে, রাজা বারবার অঙ্গুলি দিয়ে মুখ থেকে থুথু বের করে জড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টাতে বাধ্য হচ্ছে। হেকিম নিজের মৃত্যুর জন্য তৈরী ছিলেন বলেই প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। প্রতি পাতার কোণে তিনি মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে উঠে আসছে মুখে। কেতাবের শেষ পাতায় হেকিম রাজাকেই জানানোর জন্য এই প্রতিহিংসার খবরটি রেখে গিয়েছিলেন। বইপড়া শেষ রাজাও শেষ। বইয়ের পাতা শেষ হল এবং বিষবাণে রাজাও ঢলে পড়লেন। প্রবন্ধকারের শেষ কথা – 'বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

(বিঃ দ্রঃ- বড় প্রশ্নের জন্য মডিউল থেকে পড়ে ঘটানগুলি একটু বিস্তারিত করুন।)

ঙ) শূদ্র-জাগরণের প্রধান অন্তরায় শূদ্রকের মানসিক উত্তরণের অভাব- বিবেকানন্দের প্রবন্ধ অবলম্বনে এই মতের পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার মত সাজান।

উত্তর ঃ 'সমাজতন্ত্র' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ গঠন ও রাষ্ট্রশাসনকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করেছেন। প্রবন্ধের নামকরণ করেছেন সংকলয়িতা। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের অংশবিশেষে সমাজ বিবর্তনের ধারাটি স্বামীজী আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রযন্ত্র যাদের হাতে থাকে তারা অত্যাচারী হয়ে ওঠলে সমাজ যে তা বেশিদিন সহ্য করে না সেই প্রসঙ্গেই স্বামীজী উদ্বৃত মন্তব্যটি করেছেন।

প্রথমে স্বামীজী ধরিত্রীর সঙ্গে সমাজ এর তুলনা করেছেন। স্বয়ংসহা ধরিত্রীর সহ্যশক্তি অপরিমিত। আমাদের সমাজের সহ্যশক্তি ধরিত্রীর ন্যায়। বহু অত্যাচার, অনাচার, শোষন, বঞ্চনা সমাজ নীরবে সহ্য করে। রাষ্ট্রশক্তির পরিচালক নিজের অজান্তে নিজের খবর রচনা করে চলে। কারণ, সমাজের সহ্যশক্তি দেখে তারা অত্যাচার আরও বর্ধিত করে কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়ার সমধর্মী বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। সমাজ জীবন সম্পর্কেও একথা সমান সত্য। তাই বহুদিন ধরে একাধিক্রমে যদি সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চলে তা বেশিদিন সমাজ মুখ বুঝে সহ্য করতে পারে না। একদিন সমাজ বিপুল শক্তিতে জেগে ওঠে। সেদিন শোষক আর শাসকের বড় দুর্দিন।

সাধারণ মানুষের হাত থেকে ক্ষমতা আহরণ করে শাসক গোষ্ঠি হয় শক্তিমান; তাদের শক্তির উৎস জনগণ। এই চরম সত্যটি তারা ভুলে বসে থাকে ক্ষমতার মদমত্ততায়। যেদিন এই মত্ততা তাদের পেয়ে বসে সেদিনই তারা সমগ্র জনতার ওপর নির্মম পেষণমন্ত্র চালনা করে। শক্তির গর্বে তারা অন্ধ হয়ে যায়। তা না হলে তারা ক্ষমতার উৎস সম্পর্কে সচেতন থাকত। প্রচণ্ড স্বার্থপরতার ফলে তারা নানা বিক্ষোভ, অন্যায় আচরণ করতে থাকে। সমাজের মধ্যে এইভাবে নীচতা, স্বার্থপরতার পাপরাশি সঞ্চিত হতে তাকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই অত্যাচারের কোন শেষ নেই। কিন্তু আপন অত্যাচার ধীরে ধীরে ভিত দুর্বল করে তোলে। ফলে সাম্রাজ্যের কঠিন ভিত্তি ধীরে ধীরে ভাঙনের মুখে চলে আসে তাদের অজ্ঞাতসারে। যখন চেতনা হয় তখন আর করার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

সমাজ যখন বিবর্তিত হতে থাকে। শুধু পরিবর্তন নয়, একটা বিপ্লব সমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন সামজে বীর্যের উদ্বোধন ঘটে। এই উদ্বোধনে খড়-কুঠোর মতো সকল রাজশক্তি নিমিষে ভেসে যায়। শোষন, অত্যাচার, দমন, পিড়ন, স্বার্থপরতার কুটিল চক্রান্ত - সব কিছুকে দূরে নিক্ষিপ্ত করে নতুন বীর্যে জেগে ওঠে। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত পাপরাশিকে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে সমাজের নবীন কাঠামো রচনায় এই শক্তি নিয়োজিত হয়।

সমাজ-ব্যবস্থার স্বরূপই এই যে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে বঞ্চিত করে বেশিদিন রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করা যায় না। পুরোহিত গোষ্ঠি-ক্ষত্রিয় গোষ্ঠি বা বৈশ্যগোষ্ঠিকে এই সমাজসত্যটিকে স্মরণ রেখে চলতে হবে। অন্যথায় তাদের পতন অবধারিত। এইভাবেই সমাজ থেকে পুরোহিত গোষ্ঠির কর্তৃত্বলুপ্ত হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের বাহুবল এইভাবে বৈশ্যশক্তির কাছে বিক্রয় হয়ে গেছে।

বর্তমান পৃথিবীতে ও ভারতবর্ষে এখন বৈশ্যগোষ্ঠি অবিরাম শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রক্ষমতা তারা নিজ হাতে গ্রহণ করেনি সত্যম কিন্তু পরোক্ষভাবে তারাই রাষ্ট্রযন্ত্রের ধারক ও বাহক। অতএব তাদের এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ শূদ্রসমাজকে প্রবঞ্চিত করে বেশিদিন ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না। সাধারণ জনতা কখনই তা বেশিদিন নত মস্তক সহ্য করেনা। সামাজিক নিয়মেই সমাজের মলিনতার দূর করার উপায় নির্ধারিত হয়। পরিবর্তন জাগতিক নিয়ম। তথাপি সমাজের সহ্যশক্তি অপরিমিত। কিন্তু এই সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে। তা যখন ছাড়িয়ে যায় তখনই দেখা দেয় সমাজে জাগ্রত চৈতন্য।

AMBITION
Edition 2017

রবীন্দ্রনাথের মতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, বিবেকানন্দের মতে, ইংরেজের গৌরব রক্ষা প্রভৃতি কারণে ইংরেজ ভারতবাসীর জন্য কল্যাণকর্ম করতে রাজী নয়। শূদ্রের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের নিপীড়নমূলক আচরণকে রবীন্দ্রনাথ কবি সুলভ মানবিক দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, যাকে নীচে ও পশ্চাতে রাখা হয়, সেই উচ্চবর্ণকে পশ্চাতে টানিছে। বিবেকানন্দ সেখানে ইতিহাসের নজির উত্থাপন করে বলেন, সমগ্র বিশ্বেই আজ উচ্চবর্ণের ও শক্তিধর রাষ্ট্রের পতনের পালা এবং শূদ্রের উত্থানের যুগ চলছে। স্বাভাবিক কারণেই বিবেকানন্দ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের দিকটিকে আশ্রয় করেছেন। অবশ্য 'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাসের তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

চ) 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ, আলোকসম্পাত ও আবহসংগীত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- রঙ্গমঞ্চের উপস্থাপনা ঃ- মঞ্চপ্রয়োগে গতানুগতিক ঊনিশ শতকীয় ব্যবসায়িক ও পেশাদরি কৌশল থেকে বাংলা নাটক মুক্তি পেল 'নবান্ন' মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিশ শতকে শিশির কুমার ভাদুরড়ির একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলা ব্যবসায়িক মঙ্গমঞ্চে প্রয়োগের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। গুটনো সিন, কাটা সিন পালটে আসবাবপত্রের ব্যবহার, সেট-সেটিংস তৈরী করা, বাস্তবসম্মত দৃশ্যসজ্জা নির্মাণ করা, ফ্লাড ও স্পট লাইটের ব্যবহার - এগুলি ক্রমে ক্রমে বাংলা মঞ্চে এসে গিয়েছিল। ফুটলাইট উঠে গেল। মঞ্চে দৃশ্য পরিকল্পনাকে বাস্তবানুগ ও ইঙ্গিতবহ করার চেষ্টাও হয়েছিল। সাজ সজ্জায় অভিনয়ে ঘষামাজা হলো। কিন্তু ব্যবসায়ী বা জমিদার মালি পরিচালিত থিয়েটারের বহু ব্যবহৃত জীর্ণ গেরাটোপের মধ্যে থেকে এই পরিবর্তনের চেষ্টা সর্বার্থে সার্থক হতে পারেনি।

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় ছিল তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অংশ। ব্যবসা বা পেশা নয়। ভাবনাগত এই মীল পার্থক্যের জন্যই নবান্নের মঞ্চাভিনয়ে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। বিষয় ও ভাববস্তুর সাথে সামঞ্চস্য রেখে প্রযোজনার সর্বাঙ্গীণস্তরে সহজ সরল ও জীবনানুগ হওয়ার চেষ্টা দেখা গেল। শিশির ভাদুড়ি নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে 'নবান্ন' মঞ্চায়নের তারিফ করেছিলেন। ঊনিশ শতকীয় মঞ্চের গোলকধাঁধা, প্যাঁচ-পয়জার, কৌশল ও আচরণের ব্যবহার প্রচলিত বন্দীত্ব থেকে বাংলা নাটকের মুক্তি ঘোষনা হলো নবান্নের প্রযোজনায়–তার প্রয়োগে, তার বিশ্বাসের জীবনমুখিতায়।

গ্রাম্যের দৃশ্যে কৃষকদের বাড়ি খড় ও বাখারি দিয়ে তৈরী করা হলো। পেছনে তিনটি 'ফ্লপ' দিয়ে চটের পর্দা ঝোলানো হলো। মঞ্চের সামনের সমতলভূমিকে চলমান জীবনের ঘটনা এবং পেছনের উঁচু প্লাটফর্মে প্রেক্ষাপটের ঘটনাগুলিকে দেখানো হলো। সাজসজ্জায় জীবন্ত দুর্ভিক্ষের মানুষগুলি যেন উঠে এলো। ছেঁড়া চট, নোংরা কাপড় পরানো হল। মেক-আপ হলো এমন যেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সব জীবন্ত হয়ে উঠলো। শহরের লোকজন, . পার্ক, হাসপাতাল, রাস্তা সব ইঙ্গিতবহ করে তোলা হলো। দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবির মানুষজনকে এমন পোষাক ও সজ্জার মঞ্চে উপস্থিত করা হলো যে তারা যেন জীবন্ত ও বাস্তবানুগ হয়ে ওঠে। যেন সেইসব ছেঁড়া নেকড়াগুলি থেকে পচা মৃতদেহের দুর্গন্ধ উঠে আসছিল।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই গণনাট্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অভিনয় করতে এসেছিলেন বলে, পূর্ব অভিনয়ের অভিজ্ঞতা সকলের না থাকলেও, শুধু অনুশীলন, চেষ্টা, আন্তরিকতা ও আদর্শবোধের দ্বারা অসামান্য অভিনয় করলেন।

এই নাটকে অভিনেত্রী যাঁরা এলেন, তাঁরা সকলেই ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়ে। ব্যবসায়িক মঞ্চে তখন অবধি তা পুরো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শুধু রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক থিয়েটারে ঘরের মেয়েদের অভিনয়ে নামিয়েছিলেন। বাংলা মঞ্চের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। কিন্তু সবই তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে, রবীন্দ্রনাথে থিয়েটার বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'সমান্তরাল থিয়েটার' হয়েই রইলো। বাংলা মঞ্চাভিনয়ের বৃহত্তর ধারার সাথে তা কোনদিন যুক্ত হতে পারেনি।

ব্যবসায়িক থিয়েটারের প্রচলিত 'তারকা প্রথা' 'নবান্ন' অভিনয়ের মাধ্যমে একেবারে ভেঙে গেল। নাটক যেমন নায়কচরতিত্র ছিল না, তেমনি অভিনয়েও অভিনেতার একক কৃতিত্ব বা কৌশল দেখানোর থিয়েটারি রীতি বন্ধ হয়ে গেল তার জায়গায় গ্রুপ এ্যাকটিং বা সব চরিত্রই সমান প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হলো। নায়ক-নায়িকা-ভিলেন বা বিশিষ্ট চারিত্রাভিনেতা খ্যাতির বিজ্ঞাপিত মুখ আর দেখা গেল না।

AMBITION
Edition 2017

নতুন ও প্রাণবন্ত থিয়েটারের ধারা 'নবান্ন'র মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে এলো– এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল জীবনের আরেক উদ্দেশ্য থেকে। পেশা থেকে নয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদে থেকেই গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' প্রযোজনা প্রথা বাংলা নাট্যপ্রযোজনার সীমারেখা ভেঙে দিল।

'নবান্ন' নাটকটি পড়ে প্রথমে কারো কারো মনে হয়েছিল যে, এই নাটকের মঞ্চোপযোগিতা বুঝি নেই। কিন্তু তার গণনাট্যসংঘের প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায় 'নবান্ন নাটকের অভিনয় বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস সাড়া ফেলে দিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী লেখায় এবং সমকালীন সংবাদপত্রের বিবরণের মঞ্চাভিনয়ের সাফল্যের কথা বারবার স্বীকৃত হয়েছে।

AMBITION

৩। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন (অনধিক ১০০ শব্দে)ঃ **৬ x ৪ =২৪**

ক) 'একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট'–'তাদের' পরিচয় দিন। প্রসঙ্গক্রমে এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করুন।

উত্তর ঃ- ঘরমুখো বাঙালী বইমুখো করার জন্য প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী নানা ধরণের মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বাঙালির বই প্রীতির একটি গল্প বলেছেন। ড্রইংরুমে বিহারিনি গেছেন বাজারে। উদ্দেশ্য স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষ্য উপহার কেনা। কিছুই পছন্দ করতে পারছেন না তিনি। দোকানদার নানা জিনিস দেয়। না, গরবিনী নারীর কোন কিছুই পছন্দ হয়নি। শেষটায় দোকানদার নিরুপায় হয়ে বলল- একখানা ভালো বই দিলে হয় না ? নাসিক কুঞ্চিত করে তৎক্ষণাৎ উত্তর সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে। জ্ঞান চক্ষু বৃদ্ধির নিমিত্ত বই কেনা তো দূরের কথা, একখানা বই-ই তার কাছে যথেষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন অনেক গল্পই বলা যায়।

সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা রম্যরচনার এক উল্লেখযোগ্য লেখক। তাঁর রচনায় হাসির উপাদানের পাশাপাশি ভ্রমণকাহিনী, রোমান্টিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী, গোয়েন্দা কাহিনী ছাড়াও ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা বিষয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনাও পাওয়া যায়।

তাঁর 'বই কেনা' প্রবন্ধটি বাঙালির বই কেনা ও বই পড়ায় উৎসাহ বাড়ার জন্যই লেখা, কারণ বাঙালির আর সব দিকে টাকা খরচ করলেও বই কেনার জন্য টাকা খরচ করতে চায় না। বরং তারা প্রকাশকদের আরো কমন টাকায় বই বিক্রি করার জন্য পরামর্শ দেয়।

ঙ) কুঞ্জ কেন নিরঞ্জনের মাথায় আঘাত করেছিল ?

উত্তর ঃ- কুঞ্জ ও নিরঞ্জনেরমধ্যে গণ্ডগোল বাঁধার সময় গণ্ডগোলের সময় কুঞ্জ নিরঞ্জনের মাথায় আঘাত করেছিলেন। কুঞ্জ যখন জোরসে হাল চালাক। সাথে সাথে নেপত্যে শুরু হয় তুমুল ঢোল কাঁসির আওযাজ। ছন্দ যেন দুলে দুলে উঠছে থেকে থেকে। এবার লাঠি খেলা। বাজিয়েরা মঞ্চের উপরে নেচে নেচে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জনতা লাল কৌপনপরা দু'জন লাঠিয়ালকে পরিবেস্টন করে দাঁড়াল। লাঠিয়ালদের বাঁ হাতে বেতের ঢাল, আর ডান হাতে হাতলাঠি। বাজনার তালে তালে পা ফেলে লাঠি খেলতে লাগল।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের বিরতির পর বৃদ্ধ দুইজন লাঠিয়ালের খেলা শুরু হল। প্রথম দিকে ঢিমে তালে খেলা শুরু হবার একটু পরেই দেখা গেল দূরে ঢোলের ছন্দ পায়ে তুলে প্রধান আসছে নাচতে নাচতে। নেপত্যে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি। কেউ শুনল না। বাজনার তালে তালে পুর্ণোদ্যমে শুরু হল লাঠিখেলা। দুলে উঠতে লাগল কেউ শুনল না। সেই সময় কুঞ্জ নিরঞ্জনের মাথায় আঘাত করেছিল।

Edition 2017

ছ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভারতীয় দর্শনের কোন দিকটিকে ডারউইনের তত্ত্বের সাথে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ- রবীন্দ্রসমকালের প্রাবন্ধিকদের মতে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রথম চৌধুরী, বনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

রামেন্দ্র সুন্দরের বিজ্ঞান বিষয়ক, দর্শন বিষয়ক, সৌন্দর্য বিষয়ক, সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি বিষযক প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তথাপি সকল শ্রেণীর প্রবন্ধেই সাহিত্য গুণ সমান ভাবে বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন– সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের প্রয়াস। কেবল গীতিমন্ত্র কেন, যদি কেন দর্শন শাস্ত্র বা রসায়ন শাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন তাহাতে আপত্তি করি না। গভীর মনের সম্পর্ক, লঘুভঙ্গি, উপমা প্রয়োগ বিজ্ঞান বিষযক ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধগুলির কাবিন্যের খোলস ভেঙে দিয়েছে। শাশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, এই দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগের ভিতরেও রামেন্দ্র সুন্দরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এই দৃষ্টান্ত এবং উপমা তিনি প্রায়ই গ্রহণ করতেন প্রাচীন ভারতীয় নানা শাস্ত্র ও সাহিত্য হইতে। ফলে তাঁহার লেখার বিষযবস্তুতেই শুধু নয়। লেখার

গীতিতেও একটি ভারতীয় গন্ধ দিল।

জ) 'কৈলাস ডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছে।' – প্রসঙ্গ আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- গল্পটির নাম 'সুন্দরম্' একটি সংস্কৃত শব্দ বিভক্তি রূপে ধরা এই নাম। নিশ্চয়ই এই নাম ব্যঞ্জনাধর্মী। গল্পের বিশেষ কোন চরিত্র-স্বভাবের ব্যঞ্জনা নয়, একটি তত্ত্বের রূপ তুলে ধরার উপযুক্ত শব্দধ্বনি। পরিস্কার বোঝা যায়, গল্পের কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র নয়, গল্পকারের প্রতিপাদ্য তত্ত্বই গল্পের অবয়বে প্রধান হয়েছে। 'সুন্দরম' কে খোঁজাই গল্পকারের যেমন লক্ষ্য, গল্পের চরিত্রদেরও তেমনি পরোক্ষ লক্ষ্য। সুকুমার যে ধরণের রূপের মোহে সংসার গঠনে তৎপর হয়, কৈলাপ ডাক্তার তার বিরোধী। এই দ্বন্দ্বের সর্বশেষে সিচুয়েশন সুকুমার সুন্দর খোঁজার ব্যর্থতায়, . কৈলাস ডাক্তারের সুন্দর বিষয়ক চিন্তায় স্থির থাকা সত্ত্বেও নমিজ সন্তানের আচরণের মূঢ়তার ভিন্ন মাত্রা পায়। সুতরাং, 'সুন্দর' তত্ত্ব তথা সুন্দর সন্ধান গল্পের দুই চরিত্রের দ্বন্দ্ব এনেছে বলেই গল্প নাম সার্থক। 'সুন্দরম' গল্পটি যেন একটি জটিল তত্ত্বেরই বস্তুনিষ্ঠ নির্ভর মধ্যবিত্ত জীবনের রসরূপ।

নারীর দেহের 'রূপ' আর 'স্বরূপ'–কোথায় যথার্থ সৌন্দর্য ? স্বরূপ শব্দ অবশ্যই তার চারিত্র্য ধরে এখানে আলোচ্য নয়, আলোচ্য রক্ত মাংসের দেহের ভিতর স্বভাব ধরে। রূপ শরীরের সুস্থতা প্রমাণ করে। বাইরের রূপ সুন্দর, অথচ দেহের ভিতরে আছে রূপের বিকৃত স্বভাব–তা কোন ক্রমেই কাম্য নয়, তা সুন্দর নয়। গণিকার দেহের ভিতরের রূপে আছে কৃত্রিমতা, কারণ তার অসংযত লালসাসিক্ত শিঙ্খল দেহ ভোগের যৌন জীবন তার ভিতরকে অসুন্দর করে। সামাজিক সাংসারিক মানুষ মধ্যবিত্ত জীবন স্বভাব ও মানসে শরীর বাইরের রূপের কৃত্রিমকতায় ভুলে যায়। সুকুমার ও তার বাড়ির লোকজন তাই করেছে। কিন্তু তুলসীর দেহের অভ্যন্তরের যে রূপ, তা সুশৃঙ্খল, যৌবন দীপ্ত, স্বাস্থ্য সমুজ্জল। তার রূপ নির্মল নিষ্পাপ। তা তার শরীরের স্বরূপ। কৈলাস ডাক্তার তা দেখিয়ে আসন সুন্দরমকে অর্থাৎ দেহের স্বরূপকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাই যেখানে সুকুমার সম্পূর্ণ ব্যর্থ সেখানে সুন্দরম বলতে ডাক্তারের বিচারেই তা প্রমাণ হয়ে ওঠে। দেহের রূপ থেকে দেহের স্বরূপের ব্যাখ্যায় ও প্রাধান্যে এমন নাম শিল্প মর্যাদা পায়।

গল্পের মধ্যে গল্পকার জানিয়েছেন, কৈলাস ডাক্তারের চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়। কথাটা ঘুরিয়ে একটা প্রশ্ন জাগায়। পৃথিবীতে অসুন্দর বলে কোন বস্তু আছে কিনা। অর্থাৎ সুন্দর কে দেখার চোখ না থাকার জন্যই মানুষ অসুন্দরকে কল্পনা করে। আসলে কৃত্রিম সামাজিক সংস্কারের বৃত্ত থেকেই একজন মানুষ অসুন্দরকে দেখে। মূলত সবই সুন্দর। যখন বাস্তব প্রয়োজনে তাকে কৃত্রিম করা হয়, তা তাদের চোখে সুন্দর, আসলে সে অসুন্দর। স্বার্থবুদ্ধি, কুসংস্কার ও কৃত্রিমতাই অসুন্দরের জনক। সুন্দর কখনো অসুন্দর হয় না। গল্পে কৈলাস ডাক্তারের দর্শনই সত্য। সুকুমারের বিকার গ্রস্ত যৌবনতায় তুলসীকে ভোগ্য হয়েছে। সেখানে তার ভোগের যে আনন্দ তা সুন্দরকে পাওয়ার আনন্দ নয়, সুবিধাভোগী মানুষেরা যা করে এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তৃপ্ত হতে চেয়েছে মাত্র। সুকুমারের যে পাত্রী দর্শন ও সৌন্দর্যের বিচার তা-ও তার মধ্যবিত্ত কু-সংস্কারের অন্তর্গত। সুন্দরম গল্পে যে সুন্দরের সন্দীৎসা, তা মূলত সুন্দরের সংজ্ঞাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। গল্পের শেষে যে ডাক্তারের ব্যঙ্গাত্মক মোহভঙ্গ, তা গল্পের সার্থক পরিনামা বাস্তবতা, তা তাঁর বাঞ্ছিত সৌন্দর্যের তত্ত্বের বাইরের দিক। আসলে সুকুমারের আচরণ বিপরীত গল্পের যথার্থ সৌন্দর্যের তত্ত্বকেই সত্য করে। এক কথায়, অসুন্দর নয়, জীবন প্রাণের বিকাশে, প্রতিষ্ঠায় মূল এবং সত্য। তার থেকেই তৈরী হয় বাইরের অসুন্দর দিকগুলি স্বার্থ স্বর্বস্ব মানুষের চাহিদা মেটাতে সুকুমার সেই চাহিদায় তুলসীকে ভোগে সুখ পেয়েছে। পাত্রী নির্বাচনে যেমন তার আছে সংস্কারের দায়িত্ব, তেমনি তুলসীর দেহভোগে আছে বিকারগ্রস্ত বিকলাঙ্গ মানস গঠনের উপযোগী যৌনতার দাসত্ব। এই দুই দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি দরকার সুকুমার মুক্ত হতে পারেনি, সম্পূর্ণ মুক্ত মন কৈলাস ডাক্তারের সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা থেকে এখানেই তার মেরুপ্রমাণ ব্যবধান, সংশোধনের অতীত ভ্রান্তি। এমন বিচার গল্প নামের শিল্প দায়িত্ব ডাক্তারের স্থিতবুদ্ধি মনেই থেকে যায়। গল্পের নামে এই অর্থে সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা।

AMPITION
Edition 2017